www.banglainternet.com

Biography of

Marie Curie

BANGLA TRANSLATION

প্রাসঙ্গিক কথা

বিজ্ঞানের জগতে অনেক কৃতিত্ব মেরি কুরির, অনেক কিছু অর্জন করেছেন তিনি। মেরি কুরি একদিকে যেমন ছিলেন খুব ভালো একজন বিজ্ঞানী, তেমনি সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় অবস্থান ছিল তাঁর। এজন্যই এত খ্যাতি অর্জন সম্ভব হয়েছিল। কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ পেলেও খ্যাতির শিখরে পৌঁছতে কম কষ্ট করতে হয় নি তাঁকে। সেটা তাঁর পটভূমি বিচার করলেই বোঝা যায়। মেরি কুরির বাড়ি পোল্যান্ডে। সেসময় পড়শি দেশগুলোর প্রচণ্ড চাপের মুখে বড্ড বেসামাল অবস্থায় ছিল পোল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ। এরকম বিরূপ পরিস্থিতিতে, একজন শিক্ষিত পোলিশ মেয়ে হিসেবে মেরি কুরির দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াটা সত্যিই এক প্রশংসনীয় ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যে পরিবেশ থেকে উঠে এসে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেয়েছেন, সেটা সাধারণ যে কারো জন্য অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। মেরির নাম ছিল তখন মারিয়া স্ক্লোদাউস্কা। সহজাতভাবেই মেরি পেয়েছিলেন অনমনীয় মনোবল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আরো দৃঢ়তা এনে দেয় তাঁকে। এই অদম্য মনোবলের জোরেই প্যারিসের সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করেন তিনি। যে সঙ্কটে পড়লে বেশিরভাগ মানুষ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়, তিনি সেই বিরূপ অবস্থা সামলে ওঠেন ঠিক স্বাভাবিক ঘটনার মতো।

মারিয়ার জন্ম ১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর। পোল্যান্ডের ওয়ারস তাঁর জন্মস্থান। তবে সেসময় ভৌগোলিকভাবে দেশ হিসেবে পোল্যান্ডের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আঠার শতকের শেষদিকে দেশটি কয়েক টুকরোয় ভাগ হয়ে রাশিয়া, প্রুশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার ভেতর চলে যায়। তো,

banglainternet.com

১৮৬৭ সালে স্ক্লোদাউস্কিরা, অর্থাৎ মারিয়ার পরিবার যে অংশে বাস করত, সেটা ছিল রাশিয়ার একটা প্রদেশ। ১৮৩০ এবং ১৮৬৩ সালে সেখানে বড় ধরনের দুটি বিদ্রোহ ঘটে যায়। সেটা ছিল রুশদের বিরুদ্ধে পোলিশদের ব্যাপক রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ। কাজেই দেশের রাজনৈতিক টানাপড়েনের ভেতর দিয়ে কাটে মারিয়ার শৈশবকাল। পোলিশদের রুশপন্থী করে গড়ে তোলার এক নির্মম প্রক্রিয়া চলছিল তখন। এতই নিদারুণ ছিল সে পীড়ন, রুশ ভাষা তখন যে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা ছিল, তা নয়—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও পড়াশোনা চলত এ ভাষায়। হ্যাঁ, পোলিশ ভাষাও চলত স্কুলগুলোতে, তবে বিবেচিত হত একমাত্র বিদেশী ভাষা হিসেবে।

গণবিক্ষোভের সময় মারা যায় কিছু পোলিশ নাগরিক। রুশরা হাজার হাজার পোলিশকে ধরে নিয়ে যায় হিমশীতল সাইবেরিয়ায়। মারিয়ার মামাও পড়ে গিয়েছিলেন এই ধরপাকড়ে। এই বিদ্রোহীদের কিছুসংখ্যক পালিয়ে যায় দূরদেশে, বেছে নেয় স্বেচ্ছানির্বাসন। মারিয়ার চাচাও ছিলেন এর মধ্যে। পালিয়ে যাওয়া পোলিশরা অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিল ফ্রান্সে। পোলিশ সমাজে তখন যখন যেখানে সুযোগ ঘটেছে, ঢুকে পড়েছে রুশরা। সামাজিক এই পরিবর্তন ব্যাপক প্রভাব ফেলে মারিয়ার জীবনে। এমনকি সেসময় রাস্তা এবং দোকানপাটে যেসব সাইনবোর্ড দেখা যেত, সেগুলোও ছিল রুশ ভাষায় লেখা।

উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে, পোলিশদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছল, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ করে রুশদের কর্তৃত্বের জোয়াল যে কাঁধ থেকে ফেলে দেওয়া যাবে না, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তবে রুশদের নির্যাতন-নিপীড়নের মোকাবিলা করার বিকল্প কিছু পথ ছিল পোলিশদের। মারিয়া এই বিকল্প পথেই দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে, মারিয়ার জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়, যখন বিজ্ঞানের জগতে চলছে অন্যতম সেরা বিপ্লব। এই বিপ্লবে অংশ নেওয়ার জন্য যথাসময়ে জন্মেছিলেন তিনি। উনিশ শতকের শেষদিকে পারমাণবিক গবেষণার একেবারে মূলকেন্দ্রে প্রবেশ করে মানুষ। প্রথমদিকে ব্যাপারটি ঘটে অজ্ঞাতসারে। মারিয়ার যখন জন্ম হয়, তখনো সব বিজ্ঞানীর মনে পরমাণুর অস্তিত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণে বড় ধরনের সাফল্য দেখা যায় ১৮৯৫ সালে, যখন জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী উইলহেম রন্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। এর আগে পরমাণুর অস্তিত্ব অনুধাবনের যে সুযোগগুলো বিজ্ঞানীদের সামনে ধারাবাহিকভাবে এসেছে, সেসব সুযোগের স্থায়িত্ব ছিল খুব কম। বিজ্ঞানীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত হারিয়ে গেছে সুযোগ বা ঘটনা।

উনিশ শতকের ৯০ দশকের দিকে, অনেক পদার্থবিজ্ঞানীর মতো রন্টজেনও ক্যাথোড-রে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। একটা ফাঁপা টিউবের ভেতর স্থাপিত তারের বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে নির্গত বিকিরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তিনি। রশ্মি-কণাগুলো যখন (বর্তমানে যা ইলেকট্রন প্রবাহ নামে পরিচিত) একটা অস্তিমান পদার্থকে আঘাত করে, এই সঙ্ঘর্ষ থেকে দ্বিতীয় দফায় বিকিরণ তৈরি হয়—যা অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। এই বিকিরণের প্রভাব শুধু ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে ফটোগ্রাফিক প্লেট বা ফিল্মে। আর তখনই শুধু এই প্রভাব ফুটে উঠবে, যখন শক্তিশালী বিকিরণের মাধ্যমে ফ্ল্যাশ বা আলো তৈরি হবে। ক্যাথোড-রে পরীক্ষার সময় রন্টজেন একটা ফ্লোরেসেন্ট স্ক্রিন রেখে দেন রে-র সামনে। এবার আলোর ঝলকানির গুপ্তরহস্য চিহ্নিত করেন তিনি। দ্বিতীয় দফা বিকিরণের কারণটা দ্রুত নির্ণয় করে তার নাম দেন এক-রেডিয়েশন। গাণিতিক সমীকরণে 'এক্স' বলতে বরাবরই অজ্ঞাত পরিমাণকে বোঝায়।

ক্যাথোড রে-র যে বৈশিষ্ট্য, সেটা বের করেন জে. জে. থমসন। এ ব্যাপারে দলগতভাবে ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান তিনি। ইংল্যান্ডের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে এই পরীক্ষাগুলো সাফল্যের সাথে শেষ হয় ১৮৯৭ সালে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবিষ্কৃত হয় ক্যাথোড-রে। আর উনিশ শতকের ৭০ দশকের দিকে, উইলিয়াম ক্রুক্স প্রথমবারের মতো কিছুটা বিশদভাবে অনুসন্ধান চালান এই রশ্মির ব্যাপারে। এমনকি ক্রুক্স এটাও লক্ষ্য করেন, ক্যাথোড-রে টিউবের সামনে রাখা প্লেটগুলো কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আবিষ্কারের সাথে কোনো সঙ্গতি রক্ষা করছে না। থমসনই ক্যাথোড-রে সম্পর্কে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন, এই রশ্মি

banglainternet.com

ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আলোককণা (ইলেকট্রন)। থমসন এটা প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে যান, এই খুদে কণাগুলো কোনোভাবে পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর পেছনে পরমাণুর বেশিরভাগ উপাদান ফেলে এসেছে ধনাত্মক আয়ন হিসেবে।

বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ একটি পরমাণু দিয়ে পরীক্ষাটা শুরু করা যেতে পারে। সেখান থেকে ঋণাত্মক চার্জবাহী কিছু উপাদান সরিয়ে নিলে দেখা যাবে, ধনাত্মক চার্জবাহী আয়ন পড়ে আছে বাকি উপাদানের মাঝে। এই উপাদানগুলোই কিন্তু পরমাণুর গাঠনিক শেষ উপাদান নয়, এর চেয়ে আরো খুদে কণার অস্তিত্ব রয়েছে—সে কণাগুলোর রয়েছে নিজস্ব অধিকার। থমসনের এই সাফল্যের পর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নতুন এক পৃথিবী উন্মোচিত হয় বিজ্ঞানীদের সামনে।

১৮৯৬ সালে, এক্স-রে আবিষ্কার এবং ক্যাথোড রে-র বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্তকরণের মাঝামাঝিতে এসে, প্যারিসে গবেষণা চালিয়ে তেজস্ক্রিয়তা উদ্ভাবন করেন হেনরি বেকুইয়েরেল। এই আবিষ্কারের গতিপ্রকৃতি নিহিত ছিল রঞ্জেনের গুরুত্বপূর্ণ এক্স-রে আবিষ্কার এবং থমসনের সুপরিকল্পিত পরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ইলেকট্রন শনাক্তকরণের পদ্ধতির মাঝে। ইউরেনিয়াম লবণ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন বেকুইয়েরেল। সূর্যের আলোতে ইউরেনিয়াম লবণের মাঝে এক্স-রের মতো এক ধরনের উদ্দীপনা দেখতে পান তিনি। অনুপ্রভার মতো জ্বলতে দেখা যায় ইউরেনিয়াম লবণ। এ ধরনের বেশ কটি পরীক্ষা চালাতে গিয়ে একবার তিনি একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে ব্ল্যাক পেপারে মুড়িয়ে রেখে দেন ইউরেনিয়াম লবণের একটি ডিশের নিচে। পরে ইউরেনিয়াম লবণকে সূর্যের আলোতে রেখে দেখতে পান, ব্ল্যাক পেপার ভেদ করে ফটোগ্রাফিক প্লেটে কুয়াশার মতো ঝাপসা একটা কিছু ফেলেছে এই লবণ। পরে বেকুইয়েরেল ইউরেনিয়াম লবণের ডিশের নিচে আরেকটি ফটোগ্রাফিক প্লেট রেখে দু দিনের জন্য পুরো আয়োজনটাকে আবদ্ধ করে রাখেন একটা কাবার্ডে। তারপর কাবার্ড খুলে ফটোগ্রাফিক প্লেটে আবার কুয়াশা দেখতে পান তিনি। তাতে বোঝা যায়, ইউরেনিয়াম রোদে থাকুক বা না থাকুক, এক ধরনের সুভেদ্য তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে এই পদার্থের।

এক্স-রে আবিষ্কারের পর ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এই বিশাল উদ্ভাবন নিয়ে। চিকিৎসা এবং বিনোদন জগতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রচুর চাহিদা তৈরি হয় এক্স-রে'র। এদিকে থমসনের ইলেকট্রন বিষয়ক কাজ নিয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হয় বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে। পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে গভীর একটা আগ্রহ জাগে বিজ্ঞানীদের। তবে বেকুইয়েরেলের আবিষ্কারের ব্যাপারটি জানাজানি হওয়ার পর, প্রথমে অল্প কজন বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয়তা তৈরির ব্যাপারটি জানতে পারেন সম্পূর্ণভাবে। একজন অল্পবয়সী গবেষকের গবেষণার মূলভিত্তি হিসেবে এটা ছিল একটা উপযুক্ত বিষয়। ১৮৯৭ সালের শেষদিকে, উদ্যমী তরুণী মেরি কুরি (তখন তিনি এ নামেই পরিচিত) এই দারুণ বিষয়টি নিয়ে লেগে পড়েন তাঁর গবেষণায়।

banglainternet.com

জীবন ও কর্ম

মারিয়ার বাবা-মা সম্পর্কে অল্প কথায় সবচেয়ে ভালো বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয়, তাঁরা ছিলেন এমন দুই জমিদার পরিবারের সন্তান, যাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বলে কিছুই আর নেই তখন। বাবা ওয়ালাদিসলর পরিবার স্ক্লোদাউস্কিদের আদি নিবাস ছিল স্ক্লোদি এলাকায়। ওয়ারসর উত্তরে এই এলাকা। মারিয়ার জন্মের শ খানেক বছর আগে সেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের জমিদারি ছিল। কয়েক শ একর জমির মালিক ছিলেন তাঁরা। মারিয়ার মা ব্রনিসলাওয়া বোগ্রসকার পরিবারও নিজ এলাকায় জমিদারি পরিচালনা করত। পরে জমিদারি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারগুলোকে জমির বিলিব্যবস্থা করে দেওয়ার ব্যবসায় নেমে পড়েন তাঁরা।

মারিয়ার বাবা-মা দু জনই ছিলেন শিক্ষক। বিজ্ঞান এবং অঙ্কে বিশেষ দক্ষতা ছিল ওয়ালাদিসলর। তবে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে রুশদের কঠোর শাসনাধীনে, কড়া নিয়মকানুনের ভেতর। মেয়েদের একটা প্রাইভেট স্কুল চালাতেন ব্রনিসলাওয়া। বিশেষ করে পোলিশ মেয়েরা ছিল সে স্কুলের ছাত্রী। সেসময় রুশ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্তৃপক্ষ চাইত না মেয়েরা উচ্চশিক্ষা নিক। তারা চাইত না, রুশদের প্রচলিত নিয়ম ভেঙে মেয়েরা গৃহিণীর ছোট্ট গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বাড়তি কিছু করুক।

১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের পর পোলিশদের স্কুলগুলোতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালায় রুশ প্রশাসন। বিশেষ করে যে স্কুলগুলোতে শুধু পোলিশ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। রুশরা মনে করত, এসব স্কুল ছিল পোলিশদের বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠার মূল উৎস।

banglainternet.com

ওয়ালাদিসল এবং ব্রনিসলাওয়া বিয়ে করেন ১৮৬০ সালে। প্রথমদিকে ব্রনিসলাওয়ার স্কুলের উপরে একটা অ্যাপার্টমেন্টে বাস করতেন তাঁরা। জায়গাটা ছিল ওয়ারসর প্রাণকেন্দ্রের কাছে। পরবর্তী সাত বছরে, স্কুলটির প্রধান থাকা অবস্থায় সাতটি সন্তান আসে ব্রনিসলাওয়ার কোলে। এই সন্তানেরা হচ্ছেন—জোফিয়া, জোজেফ, ব্রনিসলাওয়া, হেলেনা এবং সবশেষে ১৮৬৭ সালে জন্ম নেন মারিয়া। ১৮৬৮ সালে ওয়ালাদিসল একটি হাইস্কুলের সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি পান। ওয়ারসর পশ্চিমে ছিল এই স্কুল। ব্রনিসলাওয়া তখন চাকরি ছেড়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে যান ওয়ালাদিসলের নতুন স্কুলের অ্যাপার্টমেন্টে। এখানেই কাটে মারিয়ার শৈশবের দিনগুলো।

মারিয়া যদিও পারিবারিক পরিমণ্ডলে আদর–ভালবাসা এবং সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর বেড়ে ওঠেন, তবু স্ক্লোদাউস্কিদের পরিবারে তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই একটা দুঃখের মেঘ ঝুলে ছিল। যক্ষা হয়েছিল ব্রনিসলাওয়ার। সংক্রমণের ভয়ে ছেলেমেয়েদের কখনো চুমু খেতেন না তিনি। মারিয়ার বয়স যখন সাড়ে পাঁচ বছর, তাঁর মাকে তখন দীর্ঘদিন দূরে থাকতে হয়েছিল বাড়ি থেকে। এ সময় প্রথমে অস্ট্রিয়া এবং পরে ফ্রান্সে কাটান তিনি। ভিনদেশের বিশুদ্ধ মুক্ত বাতাসে থেকে চেষ্টা করেছেন যক্ষা থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু কোনো লাভ হয় নি তাতে। ১৮৭৮ সালে এ রোগেই মারা যান মারিয়ার মা। ছোট্ট মারিয়ার বয়স তখন মাত্র ১০।

এদিকে স্ক্লোদাউস্কি পরিবারে আর্থিক দৈন্য শুরু হয়েছিল আরো আগে। ১৮৭৩ সালে ব্রনিসলাওয়ার রোগমুক্তির চেষ্টা যখন মাঝামাঝি পর্যায়ে, পরিবারের আয়রোজগার তখন খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। চাকরি হারান বাবা ওয়ালাদিসল। এক রুশ ব্যক্তি আসে তাঁর জায়গায়। চাকরি হারানো মানে বাসস্থানও খোয়ানো। স্ক্লোদাউস্কি পরিবারকে সুবিধামতো একটা বাড়িতে যাওয়ার আগে ঘন ঘন বাড়ি বদলাতে হয়। শেষে ছোটখাটো এক প্রাইভেট স্কুল গড়ে তোলেন ওয়ালাদিসল। এর মধ্যে নিজের সঞ্চিত সব টাকাও খুইয়ে বসেন তিনি। শ্যালকের সাথে একটা প্রকল্পে টাকাটা খাটিয়েছিলেন বাড়তি দু পয়সার জন্য। কিন্তু বিনিয়োগটা ছিল অবিবেচকের মতো। গোটা পরিবারের অবস্থাটা তখন এমন এক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল, এই বিশাল পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে স্ক্লোদাউস্কি ছেলেমেয়েদেরকে নিজেদের পথ নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে। বাবা–মার কাছ থেকে সাহায্যের আশা বলে কিছু আর রইল না তাদের। সন্তানদের জন্য তখন একটা কাজই শুধু করার ছিল বাবা–মার। তা হচ্ছে— পড়াশোনার প্রতি নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়ে চলা।

উনিশ শতকের সত্তর দশকের দিকে, স্ক্লোদাউস্কি পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাইরের যে স্কুলে গিয়ে পড়ত, ভয়ানক শোরগোল হত সেসব স্কুলে। ছাত্রছাত্রীদের উপচানো ভিড়ে হাটের মতো অবস্থা একেকটা স্কুলের। স্কুলের এই উপচানো ভিড়ই সম্ভবত তাদের জন্য দুঃখজনক পরিণতি নিয়ে আসে। ১৮৭৬ সালে গোটা পোল্যান্ড জুড়ে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে টাইফাস নামে এক ধরনের সংক্রামক জ্বর। জোফিয়া (জোসিয়া নামে পরিচিত) এবং ছোট্ট ব্রনিসলাওয়া (ব্রনিয়া) আক্রান্ত হয় এই জ্বরে। ব্রনিয়া যাওবা ভালো হল, মারা গেল জোসিয়া। ৩১ জানুয়ারি যখন সে মারা যায়, তার বয়স ছিল মাত্র ১৪। মাত্র ৮ বছর বয়সে বড় বোনকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মৃত্যুশোক অনুভব করেন ছোট্ট মারিয়া। অল্প সময়ের ব্যবধানে, মাত্র দু বছর পরই আবার তাঁকে ছোবল হানে মৃত্যুশোক। এবার মারা যান জগতের সবচেয়ে আপনজন মমতাময়ী মা। মাত্র ৪২ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া কাটান তিনি।

দুঃখকষ্টের মাঝে সংগ্রাম করে টিকে থাকা স্ক্লোদাউস্কি ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার বুঝতে পারে, পড়াশোনাটাই তাদের সাফল্যের একমাত্র উপায়। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সেই গন্তব্যের দিকে এগোতে লাগল তারা।

banglainternet.com

প্রাইভেট স্কুল থেকে একে একে সব ভাইবোন চলে গেল মাধ্যমিক স্কুলের জিমনেসিয়াম সিস্টেমে। প্রথমে জোজেফ, তারপর ব্রনিয়া এবং সবশেষে মারিয়া হাইস্কুল পাস দিলেন। ১৮৮৩ সালে ১৫ বছরের মারিয়া যখন জিমনেসিয়াম থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন, স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন তিনি। অবিশ্যি তাঁর ভাই জোজেফ এবং বোন ব্রনিয়াও স্বর্ণপদক পান। মারিয়ার আরেক বোন হেলেনা মন্দ ছিলেন না ছাত্রী হিসেবে, কিন্তু অন্য তিন ভাইবোনের মতো অতটা কৃতিত্ব ছিল না তাঁর।

মারিয়ার ভাই জোজেফ একটি পোলিশ পরিবারের ছেলে হয়েও মেধার জোরে সর্বশীর্ষ আসনটি দখল করে স্কুলের পাট চুকান। তারপর তিনি চলে যান ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিক্যাল স্কুলে। একজন ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তোলেন। কিন্তু সেসময় রুশ শাসনাধীনে পোল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা ছিল না মেয়েদের জন্য। ব্রনিয়া এবং মারিয়ার দু চোখে তখন ভিনদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার স্বপ্ন। হয়তোবা প্যারিস যেতে পারলে পূরণ হবে তাঁদের সে স্বপ্ন। কিন্তু টাকা কোথায়? টাকা ছাড়া তো এ স্বপ্ন পূরণ হবার নয়। সামান্য খেয়েপরে বেঁচে থাকতেই হিমশিম অবস্থা তাঁদের, এর মধ্যে আবার বিদেশ গিয়ে পড়ার খরচ!

জীবিকার জন্য মারিয়া কাজে নামার আগে বাবা তাঁকে লম্বা এক বিশ্রামের সুযোগ করে দিলেন। বছর খানেকের জন্য দেশের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে অলসভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেলেন তিনি। স্রেফ বিশ্রাম আর ছুটি উপভোগ। এর পেছনে কারণও ছিল বটে। পড়াশোনায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বাবা তাঁকে এই বিশ্রামের মাধ্যমে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর তো আর কিছু দেওয়ার ছিল না মেয়েকে। পড়াশোনার জন্য প্রচুর খাটাখাটনি যাওয়ায় বিশ্রামটা এমনিতেও প্রয়োজন ছিল মারিয়ার। মা আর বোনের মৃত্যুশোকও অবিরাম মানসিকভাবে কষ্ট দিয়েছে তাঁকে। তা—এই বিশ্রামের পেছনে কারণ যাই হোক না কেন, জীবনে মাত্র ওই একবারই অলসভাবে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পান তিনি।

বিশ্রামের ভেতর দিয়ে যখন মারিয়ার অলস একটি বছর পেরিয়ে গেল, তাঁর বাবার বয়স তখন পঞ্চাশের ঘরে, অবসর নেওয়ার সময় এসে গেছে প্রায়। স্কুলের বাড়িটি ছেড়ে এবার ছোটখাটো এক অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ওঠে স্কোদাউস্কি পরিবার। ওয়ালাদিসল তখনো চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর শিক্ষকতা। বড় দুই বোনের মতো প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু টাকা রোজগারের চিন্তা করেন মারিয়া, কিন্তু সফল হন নি। বছর খানেক পর ওয়ারসর এক ধনী পরিবারে গৃহশিক্ষিকার চাকরি নেন তিনি। তবে চাকরিটা তাঁর মনঃপূত ছিল না। শুধু টাকার জন্যই চাকরি নেওয়া। যে কদিন তিনি এ চাকরি করেছেন, প্রতিমুহূর্তে ঘৃণা কাজ করেছে তাঁর ভেতর। তবে পড়াশোনার প্রতি মারিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অটুট থেকেছে বরাবর। একদিকে তিনি যেমন নিজে নিজে পড়েছেন, তেমনি 'ফ্লাইং ইউনিভার্সিটি'তেও নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। একটা গুপ্ত সংস্থা ছিল এই 'ফ্লাইং ইউনিভার্সিটি' বা 'উড়ন্ত বিশ্ববিদ্যালয়'—এর তত্ত্বাবধানে। ওয়ারসর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মারিয়ার মতো সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার বিদ্যোৎসাহী পোলিশ মেয়েদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করত তারা। ১৮৮৫ সালে শুরু হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। ১৮৮৯ সালে, হাজার খানেকেরও বেশি পোলিশ মেয়ে নিয়মিত যোগ দিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে।

১৭ বছর বয়সে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন মারিয়া। মারিয়া এবং ব্রনিয়া দু বোন মিলে উচ্চশিক্ষার্থে প্যারিস যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। সেইসঙ্গে খুব বেশি বয়স হওয়ার আগেই কিছু টাকা দুঃসময়ের জন্য সঞ্চয়ের কথা ভাবেন। ব্রনিয়া ছিলেন মারিয়ার দু বছরের বড়। এক বছর বসে বসে খাওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা জমিয়ে ফেলেন তিনি। ব্রনিয়া চেয়েছিলেন একজন ডাক্তার হতে, এবং এই কোর্স শেষ হতে লাগে পাঁচ বছর। তখন তাঁদের যে অবস্থা, সেভাবে এই পাঁচ বছরের টাকা জমাতে গেলে, অর্থাৎ পড়াশোনা শুরু করার আগেই ব্রনিয়ার বয়স গিয়ে দাঁড়াবে ৩০।

পরিবারের সবার সব টাকা এক করার পরামর্শ দিলেন মারিয়া। তা হলে দ্রুত প্যারিস যেতে পারবেন ব্রনিয়া। মারিয়া তখন আরো ভালো কোনো পরিবারে গৃহশিক্ষিকা হবেন। নিজের খরচ বাদে বাকি সব টাকা পাঠিয়ে দেবেন বোনের কাছে, আর বাবাও তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাবেন মেয়েকে সহযোগিতা করতে, কাজেই ডাক্তারি পড়া শেষ করতে

banglainternet.com

কোনো অসুবিধা হবে না ব্রনিয়ার। আর ডাক্তার হওয়ার পর ব্রনিয়া পড়াশোনায় সাহায্য করবেন মারিয়াকে।

ব্রনিয়া প্যারিস চলে যাওয়ার পর পরিকল্পনার প্রথম অংশের বাস্তবায়ন ঘটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মারিয়া। খুঁজে বেড়াতে লাগলেন গৃহশিক্ষিকার ভালো একটা চাকরি।

শেষমেশ পাওয়া গেল সেরকম একটা কাজ। কিন্তু জায়গাটা অনেক দূরে। যে পরিবারে তিনি গৃহশিক্ষিকার কাজ পেলেন, তাঁরা থাকেন ওয়ারস থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরের একটা গ্রামে। মারিয়াকে এই পরিবার বছরে ৫০০ রুবল দেবে বেতন হিসেবে, সেইসঙ্গে থাকা-খাওয়ার ব্যাপার তো আছেই। মারিয়া তাঁর ১৮তম জন্মদিনের সপ্তাহ কয়েক পর, ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি রওনা হয়ে গেলেন নতুন জীবন শুরু করতে। আজকের এই দিনে ওয়ারস থেকে সে জায়গা মোটেও খুব দূরে নয়। কারণ এতদিনে রাস্তাঘাটের যেমন উন্নতি ঘটেছে, যানবাহন হয়েছে আরো বেশি আধুনিক এবং ভ্রমণ হয়েছে অধিকতর সহজ। কিন্তু ১৮৮৬ সালে মারিয়াকে এই ১০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল। দীর্ঘ রেল ভ্রমণের পর পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা যেতে হয়েছিল ঘোড়াগাড়িতে। বন্ধুবান্ধব এবং পারিবারিক গণ্ডি থেকে তিনি এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, যেন বোন ব্রনিয়ার মতো কোনো দূরদেশে চলে গিয়েছিলেন। এর পরেও বোনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে—এতেই ছিল তাঁর সুখ।

নতুন এই কাজে বেশ সাফল্য অর্জন করেন মারিয়া। গৃহশিক্ষিকা হিসেবে পরিবারটির সাথে বেশ সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি। পরিবারের সবাই মারিয়ার প্রতি এতটা আন্তরিক হয়ে ওঠে, তিনি যখন চাষী পরিবারের কিছু ছেলেমেয়েকে পোলিশ ভাষায় পড়াতে শুরু করেন, সক্রিয়ভাবে তাঁকে সাহায্য করে সবাই। অথচ সে যুগে পোল্যান্ডে নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্য পড়াশোনা ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সে বাড়িতে মারিয়ার মূল কাজটি ছিল পরিবারের একদম ছোট মেয়েটিকে পড়ানো। মেয়েটির বয়স ছিল ১০। প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে পড়াতে হত তাকে। তবে মারিয়া তাঁর কাজের বাইরে বড় মেয়েটিকেও পড়াতেন। এই বড় মেয়েটি ছিল মারিয়ার সমবয়সী। এত বড় ঘরের মেয়ে হয়েও জিমনেসিয়ামে পড়ার সেই ভাগ্য হয় নি তাঁর। মারিয়া প্রতিদিন ঘণ্টা তিনেক করে সময় দিতেন তাঁকে। গরিব চাষীদের ছেলেমেয়েকে প্রতিদিন দু ঘণ্টা করে সময় দেওয়ার পর বাকি যে সময়টা থাকত, এ সময় খুব করে মন দিয়ে পড়তেন মারিয়া। প্রচণ্ড জ্ঞানপিপাসা এ সময় প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানের প্রতি দারুণভাবে আগ্রহী করে তোলে তাঁকে। প্যারিসে গিয়ে উচ্চশিক্ষার ধাপটাকে যাতে জোরালোভাবে আঁকড়ে ধরতে পারেন, সেভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে থাকেন তিনি।

তবে গৃহশিক্ষিকা থাকার সময় একটা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাও হয় মারিয়ার। সে পরিবারের বড় ছেলেটি ছিলেন অঙ্কের ছাত্র। মারিয়ার এক বছরের বড় এই ছেলেটি ছিল ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছুটিতে বেড়াতে এসে মারিয়ার প্রেমে পড়ে যান তিনি। পরে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। কিন্তু ছেলেটির বাবা—অর্থাৎ মারিয়ার মনিবপক্ষ কিছুতেই মত দেন নি এ বিয়েতে। হ্যাঁ, মারিয়া তাঁদের মেয়েদের ভালো পড়ান বটে, তাঁকে পরিবারের একজন বলে গণ্যও করা হয়, তাই বলে পরিবারটির বধূ হওয়ার যোগ্যতা নেই তাঁর। বিয়ের ব্যাপারে মনিবপক্ষের এই প্রত্যাখ্যান মারিয়ার জন্য ছিল একটি অপমানকর ব্যাপার। এর পরেও মুখ বুজে সে বাড়িতে রয়ে যান তিনি। চাকরি খোয়ালে পাছে বোন ব্রনিয়াকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, নিজের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়—এই ভয়ে চাকরিটা ছাড়েন নি মারিয়া। ততদিনে পদার্থবিজ্ঞান, অঙ্ক আর রসায়নের প্রতি দারুণ ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছে তাঁর। তবে ১৮৮৯ সালে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় দিন ঈস্টার-ডেতে যখন পরিবারটির সাথে মারিয়ার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তারপর আর ওই বাড়িতে থাকেন নি তিনি।

banglainternet.com

ততদিনে মারিয়ার আর্থিক অবস্থার অন্তত উন্নতি ঘটতে শুরু করেছে। ১৮৮৮ সালের শুরুতে, রাষ্ট্রীয় পেনশন পাওয়ার অবস্থায় এসে পৌঁছলেন ওয়ালাদিসল। তবে পেনশন পেলেও একইসঙ্গে শিক্ষকতাও চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি। ওয়ারসর কাছে স্তুদজিয়েনিক–এ একটা পুনর্গঠিত স্কুলে পরিচালকের পদ পেয়ে গেলেন ওয়ালাদিসল। কাজটা ছিল বড়ই নীরস, এজন্য তুলনামূলকভাবে বেতনটাও ছিল বেশি। ফলে ব্রনিয়ার পড়াশোনার পুরোটা খরচ দেওয়ার মতো সামর্থ্য এসে গেল তাঁর। প্রতি মাসে ব্রনিয়াকে ৪০ রুবল করে দেবেন বলে লিখে দিলেন তিনি। ব্রনিয়া শিগগিরই বাবাকে জানালেন, এই ৪০ রুবল থেকে যেন ৮ রুবল করে মারিয়ার জন্য রেখে দেওয়া হয়। সঞ্চিত এই টাকার সাথে মারিয়ার রোজগার মিলে তাঁর পড়াশোনার জন্য বেশ বড় একটা ফান্ড দাঁড় করাবে।

গ্রামাঞ্চলে অনেক দিন থাকার পর মারিয়া যখন ওয়ারসর এক পরিবারে এক বছরের জন্য গৃহশিক্ষিকার কাজ পেলেন, মনটা আনন্দে ভরে গেল তাঁর। প্যারিস যাওয়ার স্বপ্নটা যেন তখনো অনেক দূরে। মারিয়ার কেবল মনে হত, এই স্বপ্ন পূরণ হতে আরো বেশ ক বছর লেগে যাবে। স্বপ্নটাকে অবাস্তব মনে হত সময় সময়।

এর মধ্যে ব্রনিয়া ভালবেসে ফেলেছেন প্যারিসে নির্বাসিত এক পোলিশ ছেলেকে। কাজিমিয়ের্জ দলুস্কি নামে এই ছেলেটি তখন শেষ বর্ষের মেডিক্যাল ছাত্র। বয়সে ব্রনিয়ার ১০ বছরের বড় তিনি। ১৮৯০ সালের মার্চে, কাজিমিয়ের্জের সাথে সম্পর্কের নাটকীয় খবরটা ব্রনিয়া লিখে জানালেন বোন মারিয়াকে। কাজিমিয়ের্জ ডাক্তার হওয়ার পর শিগগিরই বিয়ে করবেন তাঁরা। তখনো কোর্স শেষ করতে ব্রনিয়ার এক বছর বাকি। মারিয়াকে তিনি লিখলেন :

আমরা আর এক বছর থাকব প্যারিসে। এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আমার পরীক্ষা। তুমি যদি এ বছর সামান্য কয়েক শ রুবল যোগাড় করতে পার, তা হলে পরের বছর চলে আসতে পার প্যারিসে (এখানে পরের অ্যাকাডেমিক বছরকে বোঝানো হয়েছে)। আমাদের সাথে থেকে কোথাও থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে তুমি। সরবোনে পড়তে চাইলে অবশ্যই কয়েক শ রুবল লাগবে তোমার। প্রথম একটি বছর আমাদের সাথেই থাকবে তুমি। দ্বিতীয় আর তৃতীয় বছর আমাদের সাথে থাকতে না পারলেও, আমি নিশ্চিত বাবা সাহায্য করবেন তোমাকে...

কিন্তু পরিবারের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে দিতে মারিয়ার অবস্থা তখন এমন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, তাঁর এতদিনের লালিত স্বপ্নটা যে বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে—বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। হেলেনা এবং জোজেফকে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য ওয়ারসতেই থেকে যেতে চেয়েছিলেন মারিয়া। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় টানটা ছিল বাবার প্রতি। বুড়ো বাবার পাশে থেকে তাঁকে সাহায্য–সহযোগিতা করে যাওয়াটাই ছিল মারিয়ার মূল উদ্দেশ্য। আসলে স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঁর স্বপ্নটাকে শুধু স্বপ্নই মনে হত, বাস্তব বলে মেনে নিতে পারেন নি।

তবে সমস্যা অনেকখানি কেটে গেল ব্রনিয়া আর কাজিমিয়ের্জের সহযোগিতায়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্রনিয়ার গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত প্যারিসেই থেকে যাবেন। ফলে ওয়ারসতে বাবার সাথে আরো একটি বছর থেকে যাওয়ার সুযোগ পেলেন মারিয়া। ততদিনে সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছেন বাবা। মারিয়া তখন প্রাইভেট পড়িয়ে আয় করতেন, আর নিয়মিত যোগ দিতেন ফ্লাইং ইউনিভার্সিটিতে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম তখন তুঙ্গে। এ সময় একটি ল্যাবরেটরিতে ঢুকে জীবনে প্রথমবারের মতো নিজের এক্সপেরিমেন্ট চালানোর সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। জোজেফ বোগাস্কি নামে এক চাচাত ভাইয়ের কল্যাণে এ সুযোগ করে নেন তিনি। ওয়ারসের শিল্প এবং কৃষি জাদুঘরে তখন কাজ করতেন এই চাচাত ভাই। উচ্চশিক্ষার্থে প্যারিস যাওয়ার ব্যাপারে মারিয়াকে সব সময় উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁর ভাইবোন।

সব মিলিয়ে, বাড়তি এক বছর ওয়ারসতে কাটানোটা মারিয়ার ভবিষ্যতের জন্য নিঃসন্দেহে ছিল লাভজনক। এ সময় তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতি ঘটে, নিজের জীবন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার সুযোগ পান এবং প্রস্তুতি নেন জীবনের সবচেয়ে সেরা অভিযানের জন্য।

১৮৯১ সালের নভেম্বরে মারিয়া যখন ২৪ বছরে পা দিলেন, অবশেষে প্যারিসের পথে রওনা হলেন তিনি। তিন দিনের এই রেল ভ্রমণে সবচেয়ে সস্তা শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন মারিয়া। হাড় কাঁপানো শীত থেকে বাঁচার জন্য

banglainternet.com

কম্বলে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি। সরবোনের পরিবেশের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য মারিয়া নিজেকে 'মেরি' স্লোদাউস্কা হিসেবে তুলে

ধরেন সেখানে। যেহেতু এত কষ্টের পর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নটা পূরণ হতে চলেছে, কাজেই সুযোগ নষ্ট করার কোনো ইচ্ছে ছিল না মেরির। তো, প্যারিসে পৌঁছে মেরি নিজের স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার যে পটভূমি তুলে ধরলেন, তাতে বেশ কিছু ফাঁক ধরা পড়ল তাঁর জ্ঞানের পরিধিতে। তা ছাড়া ফরাসি ভাষায় যদিও তিনি ভালো ছিলেন, কিন্তু পোল্যান্ডে যে ফ্রেঞ্চ শিখেছেন, সেটা ক্লাসের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের রোজকার ভাষার মতো ঝরঝরে ছিল না। উভয় সমস্যার সমাধানের জন্য কাজে ডুবে গেলেন মেরি। সরবোনে সারাক্ষণ তিনি কাটাতে লাগলেন ফ্রেঞ্চ শোনা এবং বলার ভেতর দিয়ে, পড়াশোনায় খাটাখাটনি করতে লাগলেন প্রচুর। দেখা গেল, বোন এবং ভগ্নিপতির অ্যাপার্টমেন্টে মেরি ফিরছেন শুধু রাতের খাবার সারার জন্য, আর ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নিতে।

মেরি শিগগিরই টের পেলেন, বোনের বাড়ির স্বাভাবিক পরিবেশটা তাঁর উপযোগী নয়। পোলিশদের একটা মিলনমেলা ছিল বাড়িটি। হইচই লেগেই থাকত। ফলে মেরি মনোযোগ দিতে পারতেন না তাঁর কাজে। গভীর রাতে তরুণ ডাক্তারকে হল্লা করে ডেকে তুলত রোগীরা। মেরি ঘুমাতে পারতেন না এই উপদ্রবে। আর যদি লোকজন বা রোগীর উপদ্রব না থাকত, তখন শুরু হত আরেক যন্ত্রণা। পিয়ানো নিয়ে বসতেন কাজিমিয়ের্জ। সরবোন থেকে অ্যাপার্টমেন্টটি ছিল এক ঘণ্টার পথ। এটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল মেরির জন্য। যেতে-আসতে মূল্যবান দু ঘণ্টা নষ্ট।

ক মাসের মধ্যে মেরি তাঁর বাসস্থান বদলে এমন এক জায়গায় গেলেন, ছ তলার ওপর সত্যিই সেটা একটা চিলেকোঠা। সেটা ছিল একটা ল্যাতিন কোয়ার্টার। মেরি পরবর্তী সময়ে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ছোট্ট এই বাসাটা গরমকালে ছিল জান বের করে দেওয়া গরম, আর শীতকালে ছিল শরীর জমে যাওয়ার মতো হিম। সারা দিনে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক খরচ করে জীবন ধারণ করতেন তিনি। খাওয়াসহ দৈনন্দিন যাবতীয় কাজ সারতেন এর মধ্যে। সামান্য রুটি–মাখন আর চা দিয়ে দিন পার করতেন মেরি। কদাচিৎ একটা সিদ্ধ ডিম খেতেন শরীরটাকে ভালো রাখার জন্য। মাঝে মধ্যে বোন ব্রনিয়ার বাসায় গিয়ে খেয়ে আসার ফলে আক্ষরিক অর্থেই অনাহার থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। সরবোনে মেরির শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বেশি কিছু বলার নেই আর। কারণ ছকবাঁধা একটা নিয়মের ভেতর আঁটসাঁট জীবন কাটত তাঁর। শরীরটাকে সচল রাখার জন্য কোনোরকমে চারটে খেয়ে নিতেন তিনি, আর রাস্তায় যাতে মাথা ঘুরে পড়ে থাকতে না হয়, এজন্য ঘুমিয়ে নিতেন একটু।

এরকম কঠোর নিয়ম অনুসরণ করে ভালো ফল পেয়েছিলেন তিনি। ১৮৯৩ সালের জুলাইয়ে, স্নাতকোত্তর পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন মেরি। ততদিনে সরবোনে দুটো বছর পেরিয়ে গেছে তাঁর। ফরাসি ভাষায় এ পরীক্ষা 'লাইসেন্স এস সায়েন্সেস' নামে পরিচিত। সেসময় বিজ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মে মেরির। একটা পোলিশ পল্লীতে তখন গৃহশিক্ষিকার কাজ করতেন তিনি। বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে পাস করার পর গরমের ছুটি কাটাতে ওয়ারসতে ফিরে আসেন মেরি। দেশে ফেরার পর 'আলেক্সান্দ্রোভিচ স্কলারশিপ' নামে একটা বৃত্তি পেয়ে যান। ব্যতিক্রমী এক পোলিশ মেয়ে হিসেবে বিদেশে পড়তে যাওয়ার জন্য ৬০০ রুবলের এই বৃত্তি পান তিনি। আবার প্যারিস ফিরে গিয়ে অঙ্কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনে টাকাটা বেশ কাজে লাগে মেরির। এক বছর পড়াশোনার পর ১৮৯৪ সালে দ্বিতীয়বারের মতো এই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কয়েক বছর পর মেরি যখন আয়রোজগার থেকে কিছু টাকা জমাতে সক্ষম হলেন, সেখান থেকে ৬০০ রুবল পাঠিয়ে দিলেন আলেক্সান্দ্রোভিচ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের কাছে। তাঁরা বেশ অবাক

banglainternet.com

হয়ে গেলেন মেরির এই কাণ্ডে। কারণ মেরিকে এই ৬০০ রুবল দেওয়া হয়েছিল বৃত্তি হিসেবে, যা ফেরত আসার কথা নয়। কিন্তু মেরি এই টাকাটাকে সব সময় লোন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। টাকাটা যাতে অন্য কোনো পোলিশ তরুণীর পড়াশোনায় লাগে, এজন্য বৃত্তির পুরো অঙ্কটাই ফেরত পাঠান তিনি।

পরের বছরটা বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিয়ে কাটতে থাকে মেরির। তাঁর ইচ্ছে, প্যারিস থেকে অর্জিত উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে শিক্ষকতা শুরু করবেন। সেইসঙ্গে বুড়ো বাবার দেখাশোনাটাও হবে। কিন্তু ১৮৯৪ সালের বসন্তকালের প্রথমভাগে এমন কিছু ঘটল, পাল্টে গেল মেরির জীবন। আর এই পরিবর্তনটা ঘটল পিয়েরি কুরির সাথে মেরির দেখা হওয়ার পর। মেরির বয়স তখন ২৬, আর পিয়েরি কুরির ৩৪।

পরবর্তী সময়ে পিয়েরি কুরির নামে দু রকমের লেখা প্রকাশিত হয় পত্রপত্রিকায়। দুটো লেখাই নিদারুণ আঘাত হানে তাঁর সুনামে। একটা মিথ্যে সমালোচনায় বলা হয়, পিয়েরি কুরি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানী, যিনি তাঁর স্ত্রীর ছায়াতলে থেকে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আরেকটা সমালোচনা ছিল মিথ্যে অপবাদের ওপর বাড়তি কলঙ্ক লেপন। বলা হয়, পিয়েরি কুরি মেরির পেছনে থাকা এক প্রতিভা। খেটে মরেছেন মেরি, আর সুনাম হয়েছে পিয়েরির। পত্রপত্রিকার এসব সমালোচনা ছিল চূড়ান্ত রকমের মূর্খতা। পিয়েরি এবং মেরি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে যৌথভাবে যে গবেষণা করেছেন, তাতে উভয়েরই কৃতিত্ব ছিল সমান। তাঁদের সম্মিলিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধান যে ব্যাপারটি, তাতে তাঁরা দু জন ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। পিয়েরি এবং মেরি এককভাবে কেউ কারো কাজ করতে সমর্থ ছিলেন না, তবে যৌথভাবে গোটা একটা ব্যাপার দাঁড় করাতে পেরেছিলেন।

তবে এটা ঠিক যে, মেরির সাথে দেখা হওয়ার আগেই একজন বিজ্ঞানী হিসেবে সাফল্য পেয়েছিলেন পিয়েরি। তিনি যদি তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে মেরির সাথে যৌথভাবে গবেষণা নাও করতেন, তবুও বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা হত নিজস্ব ক্ষেত্রে (বিশেষত চুম্বকত্ব) অসামান্য অবদানের জন্য। অপরদিকে মেরির কথা বলতে গেলে, তাঁর যা কিছু খ্যাতি—সব এসেছে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা থেকে। কাজেই উনিশ শতকের শেষদিকে, নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে, পিয়েরি কুরির বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সাথে যখন তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারটি আসে, কিছুটা অবান্তর মনে হয়।

পিয়েরি কুরির জন্ম ১৮৫৯ সালের ১৫মে। জন্মস্থান প্যারিস। তিনি ছিলেন এক ডাক্তারের ছেলে। জ্যাকুয়েস নামে এক বড় ভাই ছিল তাঁর। এই ভাইটিও একজন ভালো বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের বাবা ইউজিন ছিলেন অন্যরকম মানুষ। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে যে বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়, সেই অসফল বিপ্লবে অংশ নিয়ে যুদ্ধ করেন তিনি, এবং আহত হন। ১৮৭১ সালে অশান্ত প্যারিসে যখন ভিন্ন ধারার শাসন প্রবর্তিত হয়, ইউজিন তখন নিজের বাড়িটাকে একটি জরুরি হাসপাতালে রূপান্তরিত করেন। দুই ছেলে জ্যাকুয়েস এবং পিয়েরির মাধ্যমে রাস্তা থেকে যুদ্ধাহতদের নিয়ে এসে চিকিৎসা করতেন তিনি। সেসময়কার প্যারিস প্রশাসনের বিপক্ষে ছিলেন ইউজিন। কাজেই দুই ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন। এর চেয়ে বরং বাড়িতে নিজেই ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটি তাঁর ভালো মনে হয়েছিল। বাড়িতে বাবার কাছে বসে পড়াশোনা করতে গিয়ে ভালোই করলেন ছেলেরা। বিশেষ করে পিয়েরি। বিজ্ঞানের প্রতি শুরু থেকেই দারুণ ঝোঁক ছিল তাঁর। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক এবং আক্ষরিক পড়াশোনার সাথে পিয়েরির বিস্তর ফারাক ছিল, তবু ছাত্র হিসেবে বেশ উন্নতি করেন তিনি। ১৪ বছর বয়সে পিয়েরির জন্য একজন গৃহশিক্ষক রাখা হয়, যাতে তাঁর অঙ্কের ভিতটা আরো মজবুত হয়ে ওঠে। ১৬ বছর বয়সে সরবোনে প্রবেশ করেন পিয়েরি। ১৮ বছর বয়সে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাস করে একজন সহকারী হিসেবে যোগ দেন সরবোনের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। সেসময় জ্যাকুয়েসও একই পদে কাজ করছিলেন সরবোনের খনিবিজ্ঞান বিভাগে। জ্যাকুয়েস এবং পিয়েরির মাঝে বরাবরই একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। শিগগিরই দু ভাই মিলে শুরু করে দিলেন গবেষণা।

যদিও দু ভাই স্ফটিকের প্রতিসাম্য নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তবে তাঁরা আবিষ্কার করলেন কিছু স্ফটিক চাপের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করে, যে

banglainternet.com

জিনিসটি আজ 'পিয়েজো ইলেক্ট্রিসিটি' নামে পরিচিত। পিয়েরির বয়স তখন মাত্র ২১। অগ্রজ জ্যাকুয়েস ছিলেন তাঁর চেয়ে চার বছরের বড়। গবেষণালব্ধ

অভিজ্ঞতাকে কৌশলে পরিণত করে খুদে বিদ্যুৎ-প্রবাহ মাপার যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন তাঁরা। তাঁদের সেই উদ্ভাবনের খবর প্রকাশিত হল পত্রপত্রিকায়।

কাজটা জ্যাকুয়েসের ডক্টরাল থিসিসের ভিত্তি গড়ে দিল। কিন্তু পিয়েরি ছিলেন বাবার মতো, কোনো রীতিনীতির ধার ধারতেন না। নিজের জন্য কোনো থিসিস লেখার ঝামেলায় যান নি তিনি।

১৮৮৩ সালে জ্যাকুয়েস কাজ করতে চলে গেলেন মন্টপেলিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিয়েটাও সেরে ফেললেন। পিয়েরি যোগ দিলেন নতুন এক ল্যাবরেটরির প্রধান ব্যক্তি হিসেবে। ল্যাবরেটরির নাম ইকোল মিউনিসিপাল দ্য ফিজিক্ এট চাইমি ইন্ডাস্ট্রিয়েলেস (ইপিসিআই)। সেখানে তিনি পড়ানোর পাশাপাশি গবেষণাও চালিয়ে যেতেন। শুরুতে অবিশ্যি কিছুটা সমস্যা হয়েছিল পিয়েরির। জ্যাকুয়েস সব সময় মনে করতেন, নতুন এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পিয়েরির যোগদান তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রটি ধ্বংস করে দেবে। কারণ নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইপিসিআইকে দাঁড় করানোটা পিয়েরির জন্য খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রতিষ্ঠান নতুন হলেও ল্যাবরেটরিটি স্থাপন করা হয় পুরোনো দালানের ভেতর। কাজেই গবেষণাগারের সাজসজ্জা নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন পিয়েরি। তার ওপর আবার ছিল পড়ানোর ঝামেলা। তবে এত খাটাখাটনি সত্ত্বেও একজন শিক্ষক হিসেবে এ সময় অত্যন্ত সুখী ছিলেন পিয়েরি। অবাধ স্বাধীনতা ছিল বলে কাজ করে আনন্দ পেতেন, নিজের মতো করে শিক্ষা দিতেন।

অ্যাকাডেমিক স্ট্যাটাস বা খ্যাতির প্রতি একেবারেই উদাস ছিলেন তিনি। উনিশ শতকের আশির দশকের দিকে, প্রতিসাম্যের নীতিমালা নিয়ে পিয়েরি কুরির যে তাত্ত্বিক কাজ ছিল, পদার্থবিজ্ঞানে এই অবদান আজ দারুণভাবে সমাদৃত। পদার্থবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেই আবেদন রয়েছে প্রতিসাম্যের তত্ত্বের। যেমন—আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থ নিয়ে কাজ করা হয়, সেখানে ব্যাপকভাবে কাজে লাগছে প্রতিসাম্যের তত্ত্ব।

উনিশ শতকের নব্বই দশকের প্রথমদিকে চুম্বকত্বের ব্যবহারিক গবেষণার দিকে ঝুঁকে পড়েন পিয়েরি। যেসব বিভিন্ন পদার্থের চুম্বকত্ব তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে, সেগুলো নিয়ে গবেষণা করেন তিনি। শেষতক এ বিষয়ের ওপর ডক্টরাল থিসিস তৈরি হয় তাঁর। পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান, তাপমাত্রার কারণে অন্যান্য জিনিসের মাঝে কিছু পদার্থের চুম্বকত্বের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন জিনিসের চুম্বকত্বের পরিবর্তন ঘটে বিভিন্ন তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। পিয়েরি তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করান, তার ওপর ভিত্তি করেই উন্নয়ন ঘটে কোয়ান্টাম থিওরির। সেটা অবিশ্যি পিয়েরির মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনা। চুম্বকত্ব সম্পর্কে বুঝতে গেলে পরীক্ষামূলক যে ভিত্তির দরকার, আজো তার যোগানদাতা পিয়েরির পর্যবেক্ষণ। মেরির সাথে যদি তাঁর দেখা না হত, এবং তিনি যদি আরো দীর্ঘজীবী হতেন, এ কাজের জন্য হয়তোবা নোবেল পুরস্কার পেতেন তিনি।

মেরির সাথে পিয়েরির যখন পরিচয় হয়, বৈজ্ঞানিক মহলে তখন অত্যন্ত সম্মান তাঁর। অন্তত ফ্রান্সের বাইরে নাম ছড়িয়েছে পিয়েরির। বরং নিজ দেশের চেয়ে বাইরেই তাঁর সুনাম ছিল বেশি। এমনকি তিনি লর্ড কেলভিনের মতো প্রভাবশালীদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের বর্ষীয়ান এই প্রধান ব্রিটিশ ব্যক্তিত্ব প্যারিস সফরের সময় পিয়েরিকে খুঁজে নিয়ে গুণগান করেন তাঁর কাজের। নিজ দেশে পিয়েরির পরিচিতি কম ছিল ঠিকই, তাই বলে ব্যাপারটাকে খাটো করে দেখার কোনো কারণ নেই। স্বভাবে অন্তর্মুখী ছিলেন পিয়েরি, তিনি নিজেই চাইতেন না তাঁর পরিচিতি।

banglainternet.com

নিজের সম্মান খুঁজে দেখা দূরে থাক, তিনি এড়িয়ে যেতেন নিজের প্রচার। ইপিসিআই-এর পরিচালক যখন একটা অ্যাকাডেমিক অ্যাওয়ার্ডের জন্য তুলে ধরতে চাইলেন তাঁকে, তিনি ফিরিয়ে দিলেন সে প্রস্তাব। যদিও পিয়েরির আদর্শের সাথে খাপে খাপে মিলে যেত সরবোনের অধ্যাপনার ব্যাপারটি, কিন্তু তিনি অস্বস্তিবোধ করতেন একজন প্রার্থী হিসেবে অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।

চুম্বকত্ব মেরি এবং পিয়েরিকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসে। ১৮৯৪ সালের শুরুতে, মেরি এক বিশেষ দায়িত্ব পান 'সোসাইটি ফর দ্য এনকারেজমেন্ট অভ ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি' থেকে। ভিন্ন ধরনের ইস্পাতের চুম্বকত্বের গুণাগুণ নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয় মেরিকে। কিন্তু এই গবেষণা চালানোর মতো সেরকম ভালো কোনো ল্যাবরেটরি খুঁজে পান নি তিনি। পোলিশ বন্ধুদের কাছে এই সমস্যার কথা তুলে ধরেন মেরি। সেসময় পদার্থবিজ্ঞানী জোজেফ কাউয়ালস্কি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে হানিমুনে এসেছিলেন প্যারিসে। পিয়েরি কুরির কাজ সম্পর্কে জানতেন কাউয়ালস্কি। মেরিকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন পিয়েরির সাথে। পিয়েরি তখন মেরিকে সুযোগ করে দেন তাঁর গবেষণা চালানোর। খুব শিগগিরই আত্মনিবেদিত এই দুই বিজ্ঞানীর মাঝে সমঝোতা গড়ে ওঠে। পিয়েরি বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধ 'অন সিমিট্রি ইন ফিজিক্যাল ফেনোমেনা : সিমিট্রি অফ অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড'-এর একটি কপি উপহার দেন মেরিকে। তাতে লিখে দেন—'মেরি স্কোদাউস্কার প্রতি লেখকের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব, পি. কুরি।'

মেরির ছোট্ট ঘরটাতে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন পিয়েরি কুরি। পুরস্কার এবং অ্যাওয়ার্ডের প্রতি যদিও তাঁর নিজের কোনো লোভ ছিল না, তবে মেরির পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি দারুণ আগ্রহ ছিল। পরীক্ষায় প্রথম তিন জনের ভেতর মেরির স্থান থাকুক, এটাই ছিল পিয়েরির আশা। সেসময় গরমের ছুটিতে মেরি যখন ওয়ারসতে যান, তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন পিয়েরি।

মেরির কাছে এটাই প্রথম বিয়ের প্রস্তাব নয়। তিনি যখন শেষ বর্ষের ছাত্রী, অন্তত আরো একজনের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে তাঁর কাছে। ফরাসি এই ভদ্রলোকের নাম ল্যামোতি। খুব বেশি জানা যায় নি এই ভদ্রলোক সম্পর্কে। তবে ল্যামোতিকে ফিরিয়ে দিতে তেমন কষ্ট হয় নি মেরির। পিয়েরির জন্য যে এই পাণিপ্রার্থীকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তা নয়। পোল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার একটা তাড়না থেকে ফরাসি কাউকে বিয়ে করতে চান নি মেরি। তবে পিয়েরির কথা আলাদা। একে তো পিয়েরি তাঁর মতো একজন বিজ্ঞানী, তার ওপর পিয়েরির যুক্তিগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। পিয়েরি তাঁর কাছে বারবার চিঠি লিখে জানিয়েছেন, তিনি প্যারিস ছেড়ে চলে গেলে এক যুবকই শুধু নিঃসঙ্গ হবে না, শেষ হয়ে যাবে প্রতিশ্রুতিশীল এক বিজ্ঞানীর ক্যারিয়ার।

গরমের ছুটি শেষে শরৎকালে প্যারিসে আবার ফিরে এলেন মেরি। তবে তখনো বাড়তি শুধু একটি বছর প্যারিসে থাকার ব্যাপারে অটল তিনি। পিএইচ.ডি. শেষ করেই ফিরে যাবেন দেশে। এর মধ্যে একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। পিয়েরি একসঙ্গে বসবাসের প্রস্তাব দেন মেরিকে। প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেন মেরি। তাই বলে যে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তা নয়। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এ সিদ্ধান্ত নেন মেরি। পিয়েরি মেরিকে বলেন, কোথাও অধ্যাপকের কোনো পদ খালি দেখলেই সেখানে চেষ্টা করবেন তিনি। কাজেই ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। পিয়েরি আরো বলেন, মেরি তাঁকে বিয়ে করলে সব ছেড়েছুড়ে ওয়ারসতে চলে যাবেন তিনি। পিয়েরি তাঁর বাবা-মার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন মেরিকে। অবশ্যই এখানে ভালবাসার ইঙ্গিত ছিল পিয়েরির, ছিল মেরিকে খুশি করার চেষ্টা। শেষমেশ চুম্বকত্ব নিয়ে থিসিস লেখার কাজ শেষ করেন পিয়েরি। ১৮৯৫ সালের বসন্তকালে পিয়েরি হয়ে যান ড. পিয়েরি কুরি। এই কৃতিত্ব পদোন্নতি নিয়ে আসে তাঁর জন্য। ইপিসিআই-এর অধ্যাপক হয়ে যান তিনি। এই পদোন্নতি হয় মার্জিতভাবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো ধকল পোহাতে হয় নি তাঁকে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আসে কিছুটা—প্রতি মাসে ৫০০ ফ্রাঙ্ক বেতন। বিয়ে করে সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট এ টাকা। মেরি আর অটল থাকতে পারলেন না নিজের সিদ্ধান্তে। ১৮৯৫ সালের ২৬ জুলাই বিয়ে করেন মেরি আর পিয়েরি। প্যারিসের শহরতলি সিউক্স-এর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় এ বিয়ে। পিয়েরির বাবা-মা

banglainternet.com

থাকতেন এই শহরতলিতে। ওয়ারস থেকে মেরির বাবা এবং বোন হেলেনা এসে যোগ দেন বিয়ের অনুষ্ঠানে। প্যারিসে বসবাসরত

গবেষণাগারে মেরি কুরি।

আরেক বোন ব্রনিয়া এবং কাজিমিয়ের্জও যোগ দেন মেরির বিয়েতে। বিয়ের পর মারিয়া স্কোদাউস্কা হয়ে গেলেন মেরি কুরি। গরমের ছুটিটা পিয়েরির সাথে হানিমুনে কাটালেন মেরি, তারপর গবেষণায় মগ্ন হলেন পিএইচ.ডি. অর্জনের জন্য।

বিয়ের উপহার হিসেবে যে টাকা তাঁরা পেয়েছিলেন, সব মিলিয়ে একজোড়া লেটেস্ট সেফটি বাইসাইকেল কিনলেন তাঁরা। সে যুগে সেফটি বাইসাইকেল বা নিরাপদ সাইকেল বলতে দুটো চাকাই সমান বোঝাত। তখন ছোট-বড় চাকার সাইকেলের প্রচলন ছিল। কুরি দম্পতির নতুন সাইকেল দুটির নতুনত্ব ছিল বাতাসভর্তি চাকার মাঝে। অর্থাৎ তখন প্রথমবারের মতো টায়ারের প্রচলন হয় সাইকেলের চাকায়। ছুটির দিনগুলোতে সাইকেলে খুব মজা করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন মেরি আর পিয়েরি। আগস্টের শেষাশেষি একটি খামারবাড়িতে নতুন জীবন শুরু করলেন কুরি দম্পতি। দু পক্ষের কজন আত্মীয় এসে থাকতে শুরু করলেন তাঁদের সাথে।

সাইকেল চালাতে দারুণ পছন্দ করতেন মেরি আর পিয়েরি। ছুটির সময় ট্রেনে করে ফ্রান্সের দূর এলাকায় চলে যেতেন দু জন। তবে সাইকেল দুটো থাকত তাঁদের সাথে। ট্রেন থেকে নেমে সাইকেল নিয়ে ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি চলে যেতেন তাঁরা। পিয়েরি অনেক কসরত করে একটুখানি পোলিশ শিখেছিলেন মেরির কাছে। কোনো কারণে কদাচিৎ তাঁরা যদি পরস্পরের কাছ থেকে কিছু দিন দূরে থাকতেন, পিয়েরি তখন মেরির কাছে চিঠি লিখতেন পোলিশ ভাষায়। তাঁর জন্য এ কাজটা ছিল বেশ কষ্টের, তবু ভালবাসার টানে কষ্টটা মেনে নিতেন তিনি।

মধুচন্দ্রিমা থেকে প্যারিসে ফিরে গবেষণায় খুব করে মন দিলেন মেরি। একদিকে চলছিল তাঁর ইস্পাতের চুম্বকত্ব নিয়ে গবেষণা, আরেকদিকে চলছিল শিক্ষকতার সার্টিফিকেট পাওয়ার চেষ্টা। এদিকে ঘরের ভেতর ভালো একজন গৃহিণী হয়ে ওঠার দিকেও মন দিলেন তিনি। শিখতে লাগলেন রান্নাবান্না। তাই বলে যে তাঁর বিজ্ঞানের ক্ষতি হচ্ছিল, তা নয়। 'মেরি কুরি' হিসেবে তিনি বিজ্ঞানী এবং গৃহিণী—দুটোই হতে চেয়েছিলেন সমানভাবে। দুটোতেই সমান সামর্থ্য ঢেলে দিয়েছিলেন তিনি। এমনকি দুটো দিক সামলাতে গিয়ে দ্বিগুণ পরিশ্রম হলেও পরোয়া করেন নি। শিক্ষকতার জন্য ডিপ্লোমা অর্জনের চেষ্টা, ইস্পাত বিষয়ক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া এবং ১৮৯৬ সালের শেষদিকে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া—এভাবে নতুন জীবনের নানা ঝুটঝামেলা পিএইচ.ডির কাজ পিছিয়ে দিল মেরির। ডক্টরেটের কাজে থিতু হতে হতে সময় গড়িয়ে গেল ১৮৯৭ সালের শেষ নাগাদ।

মেরির গর্ভধারণের সময়টা স্বস্তিদায়ক ছিল না। এ সময় ভয়ানক অসুস্থ ছিলেন তিনি, সারাক্ষণ শুধু ঝিম্‌ঝিম্ করত মাথা। পিয়েরির মা-ও তখন শুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্তনের ক্যান্সার ধরা পড়ে তাঁর। জুলাইয়ে মেরি একাকী চলে যান ছুটি কাটাতে। দু বছরের দাম্পত্য জীবনে এই প্রথমবারের মতো আলাদা হলেন তাঁরা। মা-র অসুস্থতার কারণে তখন যেতে পারেন নি পিয়েরি। মাসখানেক পরে অবিশ্যি ব্রিটানিতে গিয়ে মেরির সাথে যোগ দেন তিনি। তারপর দু জন মিলে মেতে থাকেন তাঁদের প্রিয় শখ সাইকেল-ভ্রমণে। অথচ মেরি তখন আট মাসের প্রেগন্যান্ট। তাঁরা প্যারিসে ফিরে আসার পর খুব শিগগিরই, ১৮৯৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর প্রথম সন্তান জন্ম নেয় তাঁদের। শিশুটির নাম রাখা হয় ইরিন। তার জন্মের দু সপ্তাহ পর মারা যান পিয়েরির মা।

মেরির চারদিকে তখন যে অবস্থা, তাতে পিএইচ.ডি. করার মতো পরিবেশ নেই মোটেও। এমনকি আজকের এই আধুনিক যুগেও সেরকম

banglainternet.com

পরিবেশে গবেষণার মতো জটিল কাজ করা সম্ভব নয়। জার্মানির এল্‌সা নিউম্যান যদিও মেয়েদের ভেতর প্রথম পিএইচ.ডি. করার গৌরব অর্জন করেন, কিন্তু ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তখনো ইউরোপের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো মেয়ে ডক্টরেট করতে পারেন নি।

'ইউরেনিয়াম রশ্মি' নিয়ে মেরির গবেষণার পেছনে কারণ ছিল একটা। বেকুয়েরেলেরের মূল আবিষ্কারের পর থেকে অবহেলিত হয়ে আসছিলেন তাঁরা। পরে পিয়েরির সাথে পরামর্শ করে তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম বিষয়ক এই গবেষণায় হাত দেন মেরি। ইপিসিআই-এর পরিচালক রাজি হন মেরির এ প্রস্তাবে। গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরি ভবনের নিচতলায় ছোট্ট একটা রুম ছেড়ে দেন মেরিকে। রুমটি আসলে ছিল একটা স্টোরেজ স্পেস। বাইরের দেয়াল বেশিরভাগ ছিল কাচে আবৃত। সে কাচ আবার একক একটা কাচ, কোনো ভাগটাগ ছিল না। রুমটা ছিল সেঁতসেঁতে, বিদ্যুতের বালাই ছিল না, সঙ্গত কারণেই সেখানে ছিল তাপের অভাব। ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মেরি তাঁর এই ল্যাবরেটরির ভেতরকার তাপমাত্রা রেকর্ড করেন। ৬° সেন্টিগ্রেডের সামান্য ওপরে ছিল তাপমাত্রা। তবে গবেষণা চালানোর ছোট্ট এই জায়গার জন্য কোনো টাকাপয়সা দিতে হয় নি মেরিকে, আর মেরির কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পিয়েরি সুপারভাইজার হিসেবে থাকায় গবেষণার খরচাটাও গেছে বেঁচে। তিনি যখন যা চাইতেন, পেয়ে যেতেন পিয়েরির কাছ থেকে। সরবোনের কোনো প্রফেসরের পথনির্দেশের দরকার হয় নি এজন্য। ৩০তম জন্মদিনের পরপরই এই গবেষণা শুরু করেন মেরি, ততদিনে তাঁর প্রথম সন্তান জন্ম নিয়েছে। বাচ্চা সামলানোর জন্য পরপর বেশ কজন অল্পবয়সী আয়া রাখতে হয় তাঁদের। এই মেয়েদের বেশিরভাগই ছিল পোলিশ।

মেরির প্রথমদিককার গবেষণামূলক পরীক্ষাগুলোর ভেতর ছিল ইউরেনিয়ামের কার্যকারিতা নিখুঁতভাবে মাপজোখ করা। এই পরীক্ষাগুলোর জন্য সংবেদনশীল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন তিনি। পিয়েরি যখন প্রথম গবেষণা শুরু করেন, তখন জ্যাকুয়েসের সাথে মিলে এসব যন্ত্রপাতির উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। মেরি পরীক্ষা করে দেখেন, ইউরেনিয়াম থেকে নিঃসৃত বিকিরণ বায়ুবাহিত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এক ধরনের শক্তি তৈরি করে, যা নমুনার তেজস্ক্রিয়তা নামে পরিচিত। তিনি দেখতে পেলেন, ইউরেনিয়ামের পরিমাণটার ওপর নির্ভর করছে এই কার্যকারিতা। ভেতরকার গঠনপ্রণালী কিংবা অভ্যন্তরীণ যৌগের ওপর নির্ভর করছে না সেটা। ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওপর নির্ভর করছে পদার্থের মোট ওজন। পরীক্ষায় অ্যাক্টিভিটি যা দেখা গেল, তাতে বোঝা গেল— সেটা ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিশেষ একটা গুণ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পদার্থের গঠন সেখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। এটা ছিল সেসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুধাবন।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, ইউরেনিয়ামের পরমাণুগুলো যদি এ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা হলে কি অন্যান্য পদার্থের পরমাণুও একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে?

ব্যাপারটা বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, অন্যান্য পদার্থের কার্যকারিতা দেখার জন্য আজ পর্যন্ত আর কোনো বিজ্ঞানী পদ্ধতিগত কোনো গবেষণা চালান নি। মেরি এই পরীক্ষা শুরু করেছিলেন বিশাল এক পরিকল্পনা নিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর জানা সব রাসায়নিক পদার্থে নিজস্ব পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে পদার্থগুলোর পরমাণুর কার্যকারিতা দেখতে। তবে তিনি সাফল্য পান খুব শিগগিরই। ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, মেরি যখন ইউরেনিয়ামের খনিজ উপাদান পিচব্লেন্ডের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করেন, ইউরেনিয়ামের চেয়ে আকরিক পিচব্লেন্ডের মাঝে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বেশি। মেরি তাঁর এই সাধারণ পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। ইউরেনিয়াম বেরিয়ে আসার ঠিক এক সপ্তাহ পর আরেকটা সাফল্য এসে ধরা দেয় হাতে। এবার বেরিয়ে আসে থোরিয়াম। রাসায়নিক এই ধাতব উপাদানটি আবিষ্কৃত হয় ১৮২৮ সালে। ধাতুটি ইউরেনিয়ামের চেয়ে সক্রিয়। তবে থোরিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হয় মেরির গবেষণায়। এই খুশির ব্যাপারটি যখন ঘটে, কুরি দম্পতি তখনো জানতেন না মাত্র ক সপ্তাহ আগে থোরিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেছেন এক জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী, নাম যাঁর গারহার্ড্‌ট শ্মিড্‌ট। তবে পিচব্লেন্ডের যে চরম তেজস্ক্রিয়তা—এই আবিষ্কার একেবারে নতুন। মেরি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন,

banglainternet.com

এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা আছে শুধুমাত্র একটাই। পিচব্লেন্ডে ইউরেনিয়াম ছাড়াও এমন উপাদান রয়েছে, যা আরো বেশি সক্রিয় এবং এর আগে এই

মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে জানতে পারে নি কেউ। এই আবিষ্কার এত নাটকীয়তা সৃষ্টি করল, ১৮৯৮ সালের মার্চে পিয়েরি নিজের গবেষণা ফেলে যোগ দিলেন মেরির সাথে। তাঁদের লক্ষ্য একটাই—পিচব্লেন্ড থেকে মৌলটাকে আলাদা করা। সেইসঙ্গে মৌলটার ভৌত এবং রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে জানা। এ সময় একটা ঘটনা বড় ধরনের হতাশা নিয়ে আসে মেরি এবং পিয়েরির জন্য। সরবোনে খালি হয়েছিল অধ্যাপকের একটা পদ। মেরিকে দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ পদের জন্য আবেদন করেন পিয়েরি। কিন্তু জ্যাঁ পেরিন নামে তরুণ এক গবেষক পেয়ে যান চাকরিটা। তবে এই হতাশার মাঝেও খানিকটা সান্ত্বনা ছিল—১২ এপ্রিল বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে প্রথমবারের মতো মেরির তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ক কাগজ উপস্থাপন। গ্যাব্রিয়েল লিপম্যান নামে মেরির এক শিক্ষক পড়েন সেই কাগজ, কারণ মেরি বা পিয়েরি কেউই বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য ছিলেন না। মেরির এই কাগজটিতে প্রমাণ দেখানো হয়, পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা একটি পারমাণবিক ব্যাপার। সেইসঙ্গে এ ব্যাপারটিও তুলে ধরা হয়, পিচব্লেন্ডে ইউরেনিয়াম ছাড়া আরো তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ রয়েছে।

ইপিসিআই-এর অস্বাস্থ্যকর ল্যাবরেটরিতে অপর্যাপ্ত গবেষণা সুবিধার ভেতর দিয়ে অবিরাম এগিয়ে যেতে লাগল পিচব্লেন্ড থেকে নতুন মৌলকে আলাদা করার কাজ। কুরি দম্পতি খুব শিগগিরই নতুন মৌলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন পিচব্লেন্ডে। তাও একটি নয়, দুটি। দুটোই তেজস্ক্রিয়তার দিক দিয়ে ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশি সক্রিয়। মৌল দুটির একটির সাথে আবার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মিল রয়েছে রক্তাভ সাদা ধাতু বিসমাথের। কাজেই উন্নত যে কৌশলের মাধ্যমে পিচব্লেন্ড থেকে বিসমাথ আলাদা করা হয়, সেই একই পদ্ধতি খাটিয়ে বিসমাথের সাথে অজ্ঞাত মৌলটিকে আলাদা করলেন তাঁরা। নতুন আরেক মৌলের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া গেল বেরিয়াম ধাতুর। কুরি দম্পতি প্রথমে বিসমাথের সাথে লেগে থাকা মৌলটাকে আলাদা করতে চাইলেন। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মৌলটাকে বিসমাথ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালালেন তাঁরা। তাঁদের গবেষণালব্ধ কাগজ চলে গেল অ্যাকাডেমির টেবিলে। ১৮ জুলাই হেনরি বেকুইয়েরেল স্বয়ং পড়লেন কুরি দম্পতির প্রথমবারের মতো জমা দেওয়া যৌথ কাগজ। গবেষণালব্ধ নতুন মৌলের তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে লেখা ছিল সেই নিবন্ধ।

কুরি দম্পতি তাঁদের এই নিবন্ধে তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারটিকে 'রেডিও অ্যাক্টিভিটি' হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতির ব্যাপারটিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। বিসমাথ থেকে বের করে নিয়ে আসা নতুন ধাতব মৌলের নাম দেন তাঁরা 'পোলোনিয়াম'। 'পোল্যান্ড' থেকে 'পোলোনিয়াম'। এখনকার পোল্যান্ড তখন রুশদের কর্তৃত্বে থাকায় সত্যিকারে পোল্যান্ড বলে কোনো দেশ ছিল না। কাজেই নতুন আবিষ্কৃত ধাতুর নাম দেওয়ার বেলায় যে শুধু মেরির দেশাত্মবোধের আবেগ কাজ করেছে তা নয়, সেইসঙ্গে কুরি দম্পতির একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও কাজ করেছিল। বিশেষ করে মেরি বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন নতুন মৌলের নাম 'পোলোনিয়াম' দিয়ে। রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে চিরদিনের জন্য বহিষ্কার করতে পারত তাঁর মাতৃভূমি থেকে। তো যাই হোক, দুর্ভাগ্য হানা দিল আরেক দিক দিয়ে। পরে দেখা গেল, পোলোনিয়াম একটা স্বল্পায়ু ধাতু। ইউরেনিয়ামের প্রভাবে দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায় ধাতুটির তেজস্ক্রিয় গুণ। মাত্র ১৩৮ দিনে অর্ধেকে নেমে আসে তার সক্রিয়তা। ফলে সীমাবদ্ধ হয়ে আসে মৌলটির উপকারিতা। এর মধ্যে জুলাইয়ের দিকেও একটা সম্মানজনক ব্যাপার ঘটে কুরি দম্পতির জন্য। চুম্বকত্ব এবং তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করার কৃতিত্বস্বরূপ মেরি

banglainternet.com

জেগ্‌নার পুরস্কার পান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি থেকে। আর পুরস্কারের মূল্যমান হিসেবে অর্জন করেন ৩,৮০০ ফ্রাঙ্ক।

তারপর বরাবরের মতো কুরি দম্পতি চলে গেলেন গরমের ছুটি কাটাতে। সে বছর ব্রনিয়া এবং কাজিমিয়েৰ্জ তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন প্যারিস ছেড়ে। নতুন আবাস গড়ে তুললেন অস্ট্রিয়ান অংশে পড়া পোল্যান্ডের ভূখণ্ডে। কাজিমিয়েৰ্জ অবাঞ্ছিত ছিলেন রুশ অংশের পোল্যান্ডের ভূখণ্ডে। তরুণ বয়সে রুশবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য রুশ প্রশাসন বহিষ্কার করে তাঁকে। কিন্তু অস্ট্রিয়ান প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতায় কখনো অংশ নেন নি তিনি। কাজেই অস্ট্রিয়ার ভাগে পড়া পোল্যান্ডে স্বচ্ছন্দে থাকতে পেরেছিলেন কাজিমিয়েৰ্জ।

শরৎকালে ছুটি থেকে ফিরে আবার কাজে মন দিলেন কুরি দম্পতি। পিচব্লেন্ড থেকে এবার তেজস্ক্রিয় দ্বিতীয় মৌলটিকে আলাদা করার চেষ্টা চালালেন তাঁরা। গবেষণায় যথেষ্ট উন্নতি করলেন কুরি দম্পতি। বর্ণালি আলো ছড়ানো মৌলটিকে আকরিক থেকে আলাদা করতে সক্ষম হলেন দু জন। ধাতব মৌলটির নাম দেওয়া হল রেডিয়াম। অ্যাকাডেমির সভায় ২৬ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয় এই আবিষ্কারের কথা। পোলোনিয়ামের চেয়ে দীর্ঘদিন টিকে থাকে রেডিয়ামের সক্রিয়তা। রেডিয়াম তার অর্ধেক তেজস্ক্রিয়তা হারাতে হারাতে পেরিয়ে যাবে ১,৬২০ বছর। দীর্ঘস্থায়ী বলে চিকিৎসাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশ চাহিদা রয়েছে রেডিয়ামের।

তেজস্ক্রিয় নতুন মৌলের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর এগোনোর মতো দুটি পথ রইল তাঁদের সামনে। আলাদা দুটি পথে চলে গেলেন দু জন। পিয়েরি মন দিলেন তেজস্ক্রিয়তার অনুসন্ধানমূলক গবেষণায়, চেষ্টা করতে লাগলেন তেজস্ক্রিয়তার কারণ খুঁজে বের করতে। মেরি চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর রাসায়নিক গবেষণা। নতুন উদ্ভাবিত মৌলগুলো আরো বেশি করে আহরণের চেষ্টা চালালেন পিচব্লেন্ড থেকে, যাতে মৌলগুলোর রাসায়নিক এবং ভৌত গুণাগুণ সম্পর্কে জানা যায়। গবেষণার এই কাজটা মেরির আদর্শের সাথে মিশে গিয়েছিল। দৃঢ়সঙ্কল্প আর অদম্য মনোবল নিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে গেছেন কঠিন পরিস্থিতিতে। এসব কাজে বেশিরভাগ মানুষের ধৈর্য থাকে না। কিন্তু মেরি অটল রয়ে যান অপেক্ষায়। সিদ্ধান্ত নেন, প্রয়োজনে বছরের পর বছর অপেক্ষা করবেন তাঁর স্বপ্ন পূরণের জন্য।

তবে দেখা গেল, এক গ্রামের এক ভগ্নাংশ পরিমাণ রেডিয়াম বের করে নিতেই প্রচুর কাঁচামাল লেগে যায়। আক্ষরিক অর্থেই তার পরিমাণ টনকে টন। আর কুরি দম্পতিকে কাঁচামালটা কিনতে হত নিজেদের টাকায়। কাঁচামাল হিসেবে পিচব্লেন্ড ছিল বেশ ব্যয়বহুল। বিভিন্ন জিনিসের চাকচিক্যের জন্য কলকারখানায় ইউরেনিয়াম লবণ ব্যবহৃত হত বলে ব্যাপক চাহিদা ছিল পিচব্লেন্ডের। তবে এক্ষেত্রে একটা সুবিধা পাওয়া গেল। ইউরেনিয়াম বের করে নেওয়ার পর বাকি যে আকরিক থেকে যায়, বাজারে তার চাহিদা কম। সে আকরিক কোনো কাজে না লাগায় তার দামও বেশ সস্তা। তবে এই আকরিক যোগাড় করতে গিয়ে ঝক্কি কম গেল না কুরি দম্পতির। পিচব্লেন্ডের খনি অস্ট্রিয়ায়। সেখান থেকে ইউরেনিয়াম ছাড়া পিচব্লেন্ডের ব্যবস্থা করে সেগুলো প্যারিসে নিয়ে আসতে বিরাট ঝামেলা গেল।

এবং তাঁরা—এখানে বরং শুধু মেরির কথাই বলা যায়—অবিরাম চালিয়ে যেতে লাগলেন রেডিয়াম বের করার পদ্ধতি। জেগ্‌নার পুরস্কার থেকে মেরি যে টাকা পেয়েছিলেন, সত্যিকারে সেটা একটা ল্যাবরেটরির ব্যয়ভার যোগানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না মোটেও। তবে ইপিসিআই খালি পড়ে থাকা একটা কাঠের ঘর দিয়েছিল মেরিকে। ঘরের ছাউনিতে আবার ফুটো। এজন্য আর কেউ নিতে চায় নি ঘরটা। এখানেই মেরি টানা তিন বছর চালিয়ে যান ইউরেনিয়াম আহৃত পিচব্লেন্ড থেকে তিল তিল করে রেডিয়াম আহরণের কাজ। সেই ল্যাবরেটরিতে ধুলোবালি, ঠাণ্ডা আর সেঁতসেঁতে ভাব মিলে এমন এক দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা কারখানা-দূষণ ছাড়া আর কিছু নয়। এ যুগে সেই দূষিত পরিবেশ কোনো কলকারখানায় আশাই করা যায় না। শুধু আজকের এ যুগ কেন, বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও কোনো কলকারখানায় এরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গ্রহণযোগ্য ছিল না। তার ওপর কুরি দম্পতি যে পরিমাণ বিকিরণের মুখোমুখি হয়েছেন, ১৯০২ সালের সেই পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আতঙ্কিত হবেন আজকের আধুনিক বিজ্ঞানীরা। গবেষণার অনুপযোগী

banglainternet.com

পরিবেশে অপর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে কুরি দম্পতি যেভাবে কাজ করে গেছেন, তাতে সত্যিকার অর্থেই অন্ধকারে ডুলডুল করতেন তাঁরা। তাঁদের গবেষণার

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহনকারী নোটবইগুলো আজো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সংরক্ষিত রয়েছে। তবে কুরি দম্পতি দীর্ঘদিন নোটবইগুলো নাড়াচাড়া করেছেন বলে সেগুলোকে বিপজ্জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ নোটবইগুলোতে এখনো রয়ে গেছে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব। রেডিয়েশন-প্রুফ কন্টেইনারে আবদ্ধ রাখা হয়েছে সেগুলো।

আতঙ্কজনক এই অবস্থায় মেরির গবেষণা চালিয়ে যাওয়া, আর পিয়েরির শিক্ষকতার প্রচণ্ড চাপ সামলে নেওয়া, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াল কষ্টের এক রোমান্টিক গল্পের মতো। ইভ কুরি তাঁর মায়ের জীবনীতে লিখে গেছেন এ কথা, যে জিনিসটি আজ আধুনিক লোকাচারবিদ্যার একটা অংশ। পরবর্তী সময়ের ইতিহাসবেত্তা এবং জীবনীকাররা জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, ফরাসি সমাজে একেবারে উপেক্ষিত ছিলেন না কুরি দম্পতি। প্রথমবার মেরি জেগ্‌নার পুরস্কার পাওয়ার পর (তিনি আরো দু বার পান এ পুরস্কার), এই দম্পতি দু দফায় মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে যান। ১৯০২ সালে তারা পান ২০,০০০ ফ্রাঙ্ক, আর ১৯০৩ সালে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক। সেইসঙ্গে ছোটখাটো কিছু পুরস্কার থেকেও অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। তবে এক্ষেত্রে তাঁদের খ্যাতির ব্যাপারটা ঘটে মেরির হাড়ভাঙা খাটুনির মাধ্যমে রেডিয়াম আলাদা করার কাজের ভেতর দিয়ে। আর কুরি দম্পতির সৌভাগ্যের টার্নিংপয়েন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বলতে যা বোঝায়, সেটা কিন্তু ফ্রান্সে সুনাম ছড়ানোর মাধ্যমে আসে নি, এসেছে জেনেভা থেকে পিয়েরির অধ্যাপনার প্রস্তাব পাওয়ার মাধ্যমে।

প্রস্তাবটা আসে ১৯০০ সালে। জেনেভা থেকে আসা এই আমন্ত্রণে পিয়েরিকে যে ল্যাবরেটরি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, সেটা ছিল গবেষণার উপযোগী সব ধরনের সাজসজ্জায় পরিপূর্ণ। সেখানে পিয়েরিকে গবেষণার কাজে সহযোগিতার জন্য দু জন সহকারী দেওয়ার কথা বলা হয়। তা ছাড়া মেরিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ছিল। সেসময় অনেকের মতো সুইসরাও বুঝতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ছিল— মেরিই তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ক কাজের প্রধান। সুইসদের প্রস্তাব প্রথমে গ্রহণ করেন পিয়েরি। কিন্তু ১৯০০ সালের গরমের ছুটিতে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন কুরি দম্পতি। প্যারিসেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। শিগগিরই দু জন চলে যান শহরতলির এক মনোরম বাড়িতে। সেখানে পিয়েরির বাবা থাকতেন তাঁদের সাথে। বাড়ি ভাড়াও বেশ কম। বছরে মাত্র চার হাজার ফ্রাঙ্কের সামান্য ওপরে। সেসময় তাঁরা যে জিনিসটা ভেবেছিলেন, তা হচ্ছে—উন্নত ভবিষ্যতের আশায় প্যারিস থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ভিনদেশে গেলে পরিবার থেকে তাঁরা যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন তেমনি মেরির রেডিয়াম আলাদা করার কাজটিও ভেস্তে যাবে একেবারে।

তবে সুইসদের এ প্রস্তাবের মাধ্যমে একদিক দিয়ে উপকার হল কুরি দম্পতির। ফরাসি কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে দুই বিজ্ঞান-প্রতিভা হারানোর ভয়ে সরবোনে পিয়েরির জন্য একটা জুনিয়র টিচিং পোস্টের ব্যবস্থা করে দিল। সেইসঙ্গে পিয়েরির সুযোগ থাকল ইপিআইএ কাজ করে যাওয়ার। একই সময়, ১৯০০ সালের গরমকালের শেষ দিকে, মেয়েদের একটা প্রথম শ্রেণীর টিচার ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকতার চাকরি পেলেন মেরি। সেখানে মহিলা শিক্ষক হিসেবে তিনিই প্রথম লেকচার দেন। স্বামী-স্ত্রী দু জনের এই নতুন চাকরি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে তাঁদের জন্য। কিন্তু একইসঙ্গে কাজের চাপ বাড়ে। তাঁরা খাটতেন খুব বেশি, আবার খেতেন খুব কম, যদিও কেউ বুঝত না সেটা। এভাবে শরীরের প্রতি প্রচণ্ড রকমের অযত্ন করায় একসময় তেজস্ক্রিয়তার বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলেন দু জন।

banglainternet.com

বিশেষ করে পিয়েরি ভুগতে লাগলেন বেশি। তাঁর যেসব শারীরিক সমস্যা দেখা দিল, তাতে এক ধরনের বাত রোগের লক্ষণ ফুটে উঠল, কিন্তু এর পরেও ছুটিছাটা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে লাগলেন তাঁরা। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন পারিবারিক পরিমণ্ডলে, এমনকি ওয়ারসতেও যেতেন।

১৯০২ সালের মার্চে এক গ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ বিশুদ্ধ রেডিয়াম আহরণ করতে পারলেন মেরি। ইউরেনিয়ামমুক্ত টনকে টন পিচব্লেন্ড থেকে দিনের পর দিন রেডিয়াম আলাদা করার ফল এটা। তবে এই পরিমাণটা রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট। রেডিয়ামের পারমাণবিক ভর সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যাবে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পিরিয়ডিক টেব্‌ল-এ স্থান করে দেওয়া যাবে রেডিয়ামকে। এই আনন্দের খবর বাবার কাছে লিখে পাঠালেন মেরি। মেরির চিঠি পাওয়ার মাত্র ক সপ্তাহ পর, ১৪ মে ৭০ বছর বয়সে ওয়ারসতে মারা যান তিনি। পরের বছর রেডিয়াম আলাদা করার কষ্টে আর গেলেন না মেরি। সারাটা বছর ব্যস্ত রইলেন পিএইচ.ডি.-এর থিসিস লেখার কাজে। ১৯০৩ সালের জুনে মেরি হয়ে গেলেন ড. মেরি কুরি।

পরের কয়েকটি বছর রেডিয়ামের জন্য ছিল রমরমে সময়। উনিশ শতকের নব্বই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এক্স-রে যে জোয়ার সৃষ্টি করেছিল, রেডিয়ামও ঠিক তাই করল। রেডিয়ামের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পেছনে কারণ ছিল একটা। সেটা হচ্ছে—রেডিয়ামের বিকিরণ ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। অনেক পরে জানা যায়, অসুস্থ কোষগুলোর পাশাপাশি সুস্থ কোষগুলোকেও শেষ করে দেয় রেডিয়ামের বিকিরণ। মেরি, পিয়েরি এবং আরো যাঁরা রেডিয়াম নিয়ে কাজ করেছেন, তেজস্ক্রিয় ধাতু নাড়াচাড়া করতে গিয়ে প্রায়ই পুড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা পোহাতে হত তাঁদের।

কুরি দম্পতির জন্য ১৯০৩ সালের বছরটা গেল ভালোমন্দ মিলিয়ে। মেরি এমন এক সময় প্রেগন্যান্ট হলেন, যখন তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা শেষ। স্বামী-স্ত্রীর জন্য খুব খুশির খবর ছিল এটা। কিন্তু ১৯০৩ সালের আগস্টে, ভ্রূণের বয়স যখন পাঁচ মাস, গর্ভপাত ঘটে গেল তাঁর। সেরে ওঠার জন্য বছরের বাকি সময়টা বিশ্রাম নিয়ে কাটান তিনি। এ সময় ভাই জোজেফকে লেখা এক চিঠিতে নিজের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দেন মেরি। খুশখুশে কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং রক্তশূন্যতা মিলে এক ধরনের অবসাদ এনে দিয়েছিল তাঁর মাঝে। একই রকম রোগের লক্ষণ দেখা যায় পিয়েরির মাঝে, তার ওপর বাতের যন্ত্রণা তো আছেই। তাঁদের এই শারীরিক অসুস্থতা এবং মেরির গর্ভপাতের কারণ হিসেবে মূলত রেডিয়েশনকেই দায়ী করা হয়। ডিসেম্বরে অবিশ্যি দারুণ খুশির খবর আসে কুরি দম্পতির জন্য। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করে পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য হেনরি বেকুয়েরেলের সাথে নোবেল পুরস্কার পান তাঁরা। কুরি দম্পতির ভাগে পুরস্কারের যে টাকা পড়েছিল, সেটা ১,৫০,০০০ ক্রোনার (প্রায় ৭০,০০০ ফ্রাঙ্ক)। তাৎক্ষণিকভাবে আর্থিক সমস্যা মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল এ টাকা। সেইসঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের উপকার করে উদারতাও দেখাতে পেরেছিলেন। আর্থিক দিকটা সবল হওয়ায় শিক্ষকতার চাপটা কমিয়ে দেন পিয়েরি। তাঁরা দু জনই তখন জনসাধারণের জাতীয় সম্পদ। বিশেষ করে মেরি। মেয়েদের ভেতর তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। সেসময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি ঘটে, তা হচ্ছে সরবোনের কর্তৃপক্ষ আকস্মিকভাবে অধ্যাপকের এক বিশেষ পদে আমন্ত্রণ জানায় পিয়েরিকে। এ পদে যোগ দিতে পিয়েরিকে এখন আর যন্ত্রণাদায়ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে না। কিন্তু এই আমন্ত্রণে ল্যাবরেটরির কোনো সুবিধাদি না থাকায় পিয়েরি প্রথমে ফিরিয়ে দেন এ প্রস্তাব। সরবোন কর্তৃপক্ষ এবার তাদের প্রস্তাবে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এল। কুরি দম্পতিকে গবেষণাগারের সব রকমের সুবিধা দিতে চাইল তারা এবং মেরিকে করতে চাইল ল্যাবরেটরির প্রধান। এবার আর অমত করলেন না কুরি দম্পতি। যোগ দিলেন সরবোনে।

সবকিছুর পাশাপাশি নিজের গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন পিয়েরি। তিনি দেখতে পেলেন, বিস্ময়কর তাপ নিঃসরণ ক্ষমতা রয়েছে রেডিয়ামের। মাত্র ঘণ্টাখানেকের ভেতর এক গ্রাম পরিমাণ রেডিয়াম পানিকে জমাট বরফ থেকে ফুটন্ত পানিতে পরিণত করতে পারে। আর রেডিয়াম থেকে উৎসারিত এই তাপের সক্রিয়তার কোনো শেষ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতেই থাকে। আরো কজন বিজ্ঞানী সেসময় একই পর্যবেক্ষণ থেকে ঐকমত্যে পৌঁছেন। তাঁদের এই আবিষ্কার বিজ্ঞান

banglainternet.com

জগৎটাকে একটা তালগোলের ভেতর ফেলে দেয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। ব্যাপারটা দাঁড়ায় শুভঙ্করের ফাঁকির মতো। অর্থাৎ এত কষ্টের পর

রেডিয়াম আবিষ্কারের সময় পরেষণারত মেরি কুরি। তাঁর পাশে স্বামী পিয়েরি।

ফলটা দাঁড়াল শূন্য। বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না, রেডিয়ামের এত শক্তি আসে কোত্থে কে? 'কনজারভেশন অভ এনার্জি' মতবাদ নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় বিজ্ঞানীদের মাঝে। অথচ শক্তির অবিনাশী গুণ সম্পর্কে এই মতবাদে যা বলা হয়েছে, সেটা বিজ্ঞানের অন্যতম অলঙ্ঘনীয় ভিত্তি। এ রহস্যের সমাধানের পথ সৃষ্টি হয় শুধু তখুনি, যখন বিজ্ঞানীর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তেজস্ক্রিয়তা আসলে শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া খুদে একটা জিনিস। আর সুযোগ সৃষ্টি হয় আলবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E=mc^2$ আবিষ্কৃত হওয়ার পর। তবে সূত্রটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সবাইকে অপেক্ষা করতে হয়, আর সূত্রটির মর্ম বোঝার জন্য লেগে যায় কয়েকটি দশক।

১৯০৪ সালের শুরুতে দেখা গেল, বয়সের দিক দিয়ে চুয়াল্লিশে পৌঁছে গেছেন পিয়েরি, এবং মেরির বয়স ৩৬। দু জন যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এ পর্যন্ত আর কোনো বড় ধরনের অবদান রাখতে পারেন নি বিজ্ঞানের জগতে। এরকম প্রতিভাবানদের বেলায় প্রায়ই যা ঘটে থাকে : খুব কমই তাঁরা জীবদ্দশায় একটির বেশি ব্যতিক্রমী কাজ করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, যে কোনো সময়ে সবচেয়ে সেরা কাজগুলো তরুণেরাই করে থাকে। তখন বেশ কজন প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছে। তৃতীয়ত, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে তাঁদের মানমর্যাদা যেমন বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি গবেষণার চেয়ে প্রশাসনিক আর শিক্ষকতার ক্ষেত্রে দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। সবকিছু মিলিয়ে নতুন কিছু করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না তাঁরা। পদার্থবিজ্ঞানে অনেক উন্নতি ঘটেছে তখন। তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে জানে সবাই, জানে পরমাণু এবং তার উপাদানগুলো সম্পর্কে। তরুণ প্রজন্মের পদার্থবিজ্ঞানীরা তখন তাঁদের প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যস্ত। বিশেষ করে আর্নেস্ট রাদার ফোর্ড। কুরি দম্পতি পটপরিবর্তনকারী আরো নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারেন নি কেন, এর পেছনে বিশেষ কিছু কারণও রয়েছে বটে।

১৯০৪ সালের বসন্তকালে আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন মেরি। আগের বছরের সেই দুঃখজনক ঘটনার কথা ভেবে এবার তিনি অত্যন্ত যত্নশীল হন নিজের প্রতি। এমনকি কিছু দিনের জন্য শিক্ষকতাও ছেড়ে দেন। এবার আরেকটি মেয়ে হয় তাঁর। ৬ ডিসেম্বর জন্ম নেন ইভ। মেরির ৩৭তম জন্মদিনের প্রায় এক মাস পর জন্ম হয় ইভের। কিছু দিনের জন্য বিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে রাখেন কুরি পরিবার। তবে ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবার শিক্ষকতায় ফিরে যান মেরি। তিনি যখন প্রেগন্যান্ট ছিলেন, পিয়েরি তখন সরবোনে ব্যস্ত ছিলেন নিজের কাজে, আগুয়ান বছরের জন্য নিজের লেকচার তৈরি করে যাচ্ছিলেন। ১৯০৫ সালের জুনে কোর্স সব সুন্দরভাবে শেষ হয়ে গেলে সপরিবারে সুইডেনের স্টকহোমে গেলেন তাঁরা। সুইডিশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে দীর্ঘ-বিলম্বিত বক্তৃতা দিলেন পিয়েরি। দু জনের অসুস্থতা আর মেরির প্রেগন্যান্সির কারণে সেখানে যেতে দেরি হয়েছিল তাঁদের। নোবেল পুরস্কারকে মহিমান্বিত করতেই কুরি দম্পতির সেখানে যাওয়া। সে বছর গরমের সময়টা তাঁরা দারুণ ছুটির আমেজে কাটান নরম্যান্ডিতে। মেরির বোন হেলেনা এবং তাঁর সাত বছরের মেয়েটিও ছিলেন তাঁদের সাথে। পোল্যান্ড থেকে বেড়াতে এসেছিলেন তাঁরা।

১৯০৫ সালের শেষ দিকে নতুন রুটিন অনুযায়ী কাজ করতে লাগলেন কুরি দম্পতি। পিয়েরি ব্যস্ত রইলেন সরবোনে, আর মেরি তাঁর কাজগুলো ভাগ করে নিলেন দুই মেয়ে, ল্যাব আর শিক্ষকতার মাঝে। সব মিলিয়ে তখন তাঁদের হাসিখুশি একটা সুন্দর জীবন। দিগন্তে একখণ্ড মেঘ হয়ে

banglainternet.com

সত্যিকারে যা রয়ে গেল, তা হচ্ছে পিয়েরির শরীরটা দিন-দিন ভেঙে পড়া। মাঝে মধ্যে বিষণ্ণতায় ভুগতেন তিনি। ১৯০৬ সালের এপ্রিলে ঈস্টার উপলক্ষে কদিনের জন্য ছুটি নেন তাঁরা। মেয়েদের নিয়ে দেশের বসন্তকালীন আবহাওয়ায় ঘুরে বেড়ান দু জন। বড় সুখের সময় ছিল সেটা। তাঁদের কাছে তখন মনে হয়েছিল, আগামীতে এ পরিবারের জন্য আরো উজ্জ্বল দিন অপেক্ষা করছে। কিন্তু পিয়েরির আকস্মিক মৃত্যু ভেঙে দিল সেই সুখস্বপ্ন। ১৯ এপ্রিল মারা গেলেন পিয়েরি।

প্যারিসে একটা রাস্তা পেরোচ্ছিলেন তিনি। বৃষ্টি ছিল সেদিন। ফলে রাস্তা ছিল পিচ্ছিল। পিয়েরি পা হড়কে চলে যান ঘোড়ায় টানা ভারী ওয়াগনের নিচে। পেছনের চাকার নিচে পড়ে যায় তাঁর মাথা। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন মেরি।

তবু চলতে থাকে জীবন। পিয়েরির মৃত্যুর মাসখানেক পর তাঁর জায়গায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পান মেরি। কাজ যদিও একই, কিন্তু তাঁর পদমর্যাদা পিয়েরির চেয়ে খাটো করে দেওয়া হয়। 'চার্জ দ্য কোর্স' হিসেবে যোগ দেন তিনি। আসলে সরবোন তখনো একজন নারীকে অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত করতে চায় নি। তবে মেরিই সেখানে প্রথম একজন শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন। ৫ নভেম্বর সেখানে প্রথম লেকচার দেন মেরি। ১৯০৭ সালের বসন্তে সিউক্সে চলে যান তিনি। জায়গাটা প্যারিসের পশ্চিমে। বলতে গেলে, স্বামীর স্মৃতির দহন থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য জায়গা বদল করেন মেরি। আগের বাড়িটাতে পিয়েরির এত স্মৃতি, সেসব মনে পড়লে অস্থির হয়ে উঠতেন মেরি। পিয়েরির বাবা ইউজিন তখনো রয়ে গেছেন এ পরিবারের সাথে। পিতৃপুরুষ হিসেবে তিনি একটা ছায়ার মতো ছিলেন এ পরিবারের জন্য। কিন্তু সেই ছায়াটিও সরে গেল একসময়। ১৯১০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মারা গেলেন ইউজিন কুরি।

নতুন করে আবার হতাশায় ডুবে গেলেন মেরি। সিউক্সে পারিবারিক গোরস্থানে ইউজিনকে যখন কবর দেওয়া হয়, অদ্ভুত একটা পরিকল্পনা নেন তিনি। কবর খননকারীদের বলেন পিয়েরির কফিনটা তুলে এনে ইউজিনের কফিনের উপর রাখতে, তারপর তাঁর কফিনটা থাকবে পিয়েরির কফিনের ওপর। মেরির ঘনিষ্ঠজন এবং বন্ধুরা বুঝতে পারেন, চরম হতাশা থেকে এ ধরনের অসুস্থ চিন্তা এসেছে তাঁর মাথায়। মেরির আচার-আচরণে তখন এমন একটা ভাব, এই ৪২ বছর বয়সেই তিনি কবরে যাওয়ার জন্য একপায়ে খাড়া। জীবনের আর কানাকড়িও দাম নেই তাঁর কাছে। তবে কয়েক মাসের ভেতর ধাতস্থ হয়ে ওঠেন মেরি। আগের মতো কর্মশক্তি ফিরে আসে তাঁর মাঝে। তাঁর এই স্বাভাবিক হয়ে ওঠার মূলে ছিল ভালবাসা। সহকর্মী এক বিজ্ঞানীর সাথে হৃদয়-ঘটিত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন মেরি। নাম তাঁর পল ল্যান্‌জেভিন। সরবোনের অধ্যাপক। বয়সে মেরির চেয়ে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন তিনি। বিয়ে করেছিলেন, তবে সুখী ছিলেন না।

বছরখানেক এই প্রেম ভালোই চলেছে তাঁদের, কিন্তু তারপর আর গোপন রাখতে পারেন নি। মানুষের চরিত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে মজা পায় যেসব পত্রিকা, সেগুলোর একটায় ছাপা হল এই সম্পর্কের কথা। ব্যাস, পড়ে গেল টিটি। ১৯১১ সালের ৪ নভেম্বর প্রকাশিত হয় তাঁদের এই সম্পর্কের কথা। এ সময় কিছু দিন স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন ল্যান্‌জেভিন। ফলে গুঞ্জনটা জোরালো হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। আর দুর্নামটা রটে ঠিক তখন, নোবেল কমিটি যখন মেরিকে দ্বিতীয়বারের মতো পুরস্কার দিতে যাচ্ছে। আগেরবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছিলেন মেরি, এবার পাবেন রসায়নে (রেডিয়াম পৃথক করার জন্য)। আগেরবার যৌথভাবে পুরস্কার পেলেও, এবার আর কোনো ভাগীদার নেই। ৭ নভেম্বর মেরির দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাপ্তির খবর প্রকাশিত হয় ফ্রান্সের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। কিন্তু এ ব্যাপারে মেরির গুণগান লেখা হয় খুবই কম।

এদিকে ২৩ নভেম্বর মেরির নামে আরেকটা স্ক্যান্ডাল চলে আসে সেই পত্রিকায়। এটা একই মুখরোচক ঘটনার বাড়তি রস। ল্যান্‌জেভিনকে মেরি যে চিঠিগুলো দিয়েছেন, সেগুলোই এই কলঙ্কের উৎস। ল্যান্‌জেভিনের স্ত্রী এই চিঠিগুলো সাংবাদিকদের কাছে সরবরাহ করেন। মুখরোচক এই খবরের সাথে চাটনির মতো সংযোজিত হয় একটা লেখা, সেখানে ল্যান্‌জেভিনকে অপদস্থ করা হয় 'গেঁয়ো এবং কাপুরুষ' বলে। ল্যান্‌জেভিন পরে চ্যালেঞ্জ

banglainternet.com

করে বসেন সেই লেখককে। ২৬ নভেম্বর 'বয়েস দ্য ভিন্সেন্স'–এ লেখকটির মুখোমুখি হন ল্যান্‌জেভিন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ভেতর প্রচণ্ড বাকযুদ্ধ হয় সেখানে। তবে

শেষ পর্যন্ত হুঁশ ফিরে আসে তাঁদের। আপসরফা হয়, কেউ কারো বিরুদ্ধে আর লাগতে যাবেন না। এসব জটিলতা থাকা সত্ত্বেও আরোপিত দুর্নামের বোঝা সঙ্গে নিয়েও, স্টকহোমে নোবেল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্য সব পুরস্কার পাওয়া সঙ্গীদের সাথে যোগ দেন মেরি। ১০ ও ১১ ডিসেম্বর আয়োজিত হয় এ অনুষ্ঠান। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও দমে যান নি তিনি, বরং সাহসের সাথে বিকশিত করেছেন নিজেকে। রবার্ট রিড মেরি কুরির যে জীবনী লিখেছেন, তাতে বলা হয়েছে, মেরিকে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার দেওয়ার বেলায় বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করেছে 'নোবেল কমিটি'। কারণ ল্যান্‌জেভিনের সাথে মেরির সম্পর্কের ব্যাপারটি তখন প্রবল আলোড়ন তুলেছে বাতাসে। কাজেই মেরিকে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার দিতে গিয়ে সংহতির পরিচয় দিয়েছে নোবেল কমিটি। এ ধরনের কথা বরং নোবেল কমিটির ব্যাপারে প্রকৃত সত্যটাকেই এড়িয়ে যাওয়ার আভাস দেয়। নোবেল কমিটি কখনো কারো প্রতি এ ধরনের সংহতি দেখায় নি বা পক্ষপাতিত্ব করে নি। সেসময় একটা বিতর্কের গুঞ্জন উঠেছিল, একই ধরনের কাজের জন্য মেরিকে দুবার নোবেল দেওয়া হয়। মেরি যদি দুবার নোবেল পান, তা হলে আইনস্টাইন একবার কেন? ১৯১১ সালের নোবেল কমিটি পুরস্কার দিতে গিয়ে ভজকট পাকিয়ে ফেলেছিল—এ ধরনের ধারণা আদৌ সত্যি নয়। মাত্র একটা উদাহরণেই এর প্রমাণ মেলে। সেসময় সুইডিশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির অন্যতম উর্ধ্বতন সদস্য ছিলেন স্বান্টি

আরহেনিয়াস। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আগে মেরিকে তিনি একটা চিঠিতে লেখেন, মেরি ইচ্ছে করলে এই পুরস্কার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারেন, কারণ ল্যান্‌জেভিনের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা বিস্তারিত জানা আছে নোবেল কমিটির। জবাবে মেরি লিখে দেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ব্যক্তিগত জীবনের মাঝে কোনো যোগসূত্র নেই। এবং মেরি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সশরীরে গিয়ে পুরস্কার আনার সিদ্ধান্তে অটল থেকে যান।

তাঁর এই দৃঢ়সঙ্কল্প প্রায় মেরেই ফেলেছিল তাঁকে। প্যারিসে ফেরার পরপরই দ্রুত হাসপাতালে যেতে হয় মেরিকে। সপ্তাহ কয়েক পর শেষমেশ কিডনি সমস্যার কারণে অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। কিন্তু সেরে ওঠেন অত্যন্ত ধীরে ধীরে। পরের দুটো বছরের বেশিরভাগ সময় তাঁর কেটে যায় সুস্থ হয়ে ওঠার ভেতর দিয়ে। একটা স্যানাটোরিয়ামে কিছু দিন বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় তাঁকে, কিন্তু তিনি মেনে নেন নি এ প্রস্তাব। কারণ একটু সুস্থবোধ করা মাত্র কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। এবং সমস্ত তোড়জোড়ের ভেতর সুনিশ্চিতভাবে চুকে যায় ল্যান্‌জেভিনের সাথে তাঁর সম্পর্কটা। কাজ তেমন একটা করতেন না মেরি, তবে ভ্রমণ করতেন প্রচুর। ঘনিষ্ঠজনদের সাথে গিয়ে থাকতেন। সেসময় পেশার সাথে সম্পৃক্ত প্রিয় জায়গাটি ছিল একটি রেডিয়াম ইন্সটিটিউট। মেরি এবং তাঁর উত্তরাধিকারিণীদের জন্য অবশেষে গড়া হয় এই কাজের ক্ষেত্রটি। সেখানে বাড়িও ছিল তাদের। প্রতিষ্ঠানটি গড়া হয় রু পিয়েরি কুরিতে। মেরির সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হাসিখুশি দুই মেয়ের জন্য চমৎকার স্থান ছিল এটি।

মেরি কুরির জীবনটা আবার যখন ঝিমিয়ে পড়তে যাচ্ছে, ঠিক তখুনি বেজে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। আবার বদলে যায় মেরির জীবন। তাঁর বয়স তখন ৪৬। মেরি তখন গুরুতর অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছেন সবে, এর পরেও যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি।

বেকুয়েরেলের কাছ থেকে মেরি জানতে পারেন হাসপাতালে এক্স-রের সাজসরঞ্জামের ঘাটতির কথা। যুদ্ধাহত অস্ত্রোপচারের রোগীদের জন্য

banglainternet.com

অত্যন্ত জরুরি এই এক্স-রে। বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায় দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহে নেমে পড়েন তিনি। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতর রেডক্রস অন্যতম। তারপর এক্স-রের যন্ত্রপাতি গাড়িতে সাজিয়ে ভ্রাম্যমাণ রেডিওলজি ইউনিট গড়ে তোলেন তিনি। মেরির চাপাচাপিতে ধনী মহিলারা তাঁদের গাড়ি দান করেছিলেন এই জনসেবায়।

এক্স-রে ইউনিট নিয়ে ২০টি রেডিওলজি কার তখন যুদ্ধাহতদের সেবায় ব্যস্ত। সেইসঙ্গে ২০০টি রেডিওলজি স্টেশনও স্থাপন করা হয়। ভ্রাম্যমাণ এক্স-রে ইউনিটের একটায় মেরি নিজে ছিলেন স্বয়ং। মাঝে মধ্যে নিজেই চালাতেন গাড়ি। ফিল্ড হাসপাতালগুলোতে গিয়ে পরিচালনা করতেন এক্স-রের সাজসরঞ্জাম। খুঁজে দেখতেন আহত যোদ্ধাদের শরীরে গুলি বা বোমার টুকরো রয়ে গেছে কি না। ইভ কুরি তার আত্মজীবনীতে মায়ের এই মহান সেবা সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁর গড়া ২২০টি এক্স-রে স্টেশন সব মিলিয়ে ১০ লাখেরও বেশি যুদ্ধাহতের এক্স-রের কাজ করে। ১৯১৪ সালে মেরির আরেক মেয়ে ইরিনের বয়স ছিল মাত্র ১৭। তিনিও বিশ্বযুদ্ধের সময় মায়ের এক্স-রে দলে রেডিওগ্রাফারের কাজ করেছেন। যুদ্ধের পর মেরির আরেকটা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়। আবার স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করে পোল্যান্ড।

যুদ্ধের পর মেরির বৈজ্ঞানিক ভাবমূর্তিকে ছাপিয়ে সুবিশাল ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে তাঁর মানবসেবায় ব্রতী মহীয়সী রূপ। মেরির যদিও তখন রেডিয়াম ইন্সটিটিউট রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে গবেষণা এবং চিকিৎসা কাজে লাগানোর মতো রেডিয়াম সেখানে ছিল না। রেডিয়াম আহরণের কাজ শুরু করার মুহূর্ত থেকে মেরি পিয়েরির সাথে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই কাজ থেকে কখনো কোনোরকম বাণিজ্যিক সুবিধা তাঁরা নেবেন না। যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের যেমন পেটেন্ট নামের বৈজ্ঞানিক স্বত্ব থাকে, সে ধরনের কোনো আর্থিক সুবিধা নেবেন না তাঁরা। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে মেরি শেষমেশ কিছুটা সরে এলেন এই প্রতিজ্ঞা থেকে। মেরি মেলোনি নামে এক মার্কিন মহিলা সাংবাদিক মেরির সাক্ষাৎকার নিতে আসেন একবার। পরবর্তী সময়ে এই সাংবাদিক রেডিয়াম ইন্সটিটিউটের তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মেরি কুরির হয়ে প্রচার চালান এক গ্রাম রেডিয়াম বিক্রির জন্য। মার্কিন সাংবাদিকের এই প্রচারে বেশ কাজ হয়। ১৯২১ সালে মেরি কুরি আমেরিকা সফরে গিয়ে জনসমক্ষে হাজির হন, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে রেডিয়ামের টাকা নিয়ে আসেন। মার্কিন মুলুক সফরের অভিজ্ঞতা যদিও তেমন আনন্দময় ছিল না মেরির জন্য, তবে এক গ্রাম রেডিয়ামের জন্য শারীরিক কষ্টটা সইতে হয় তাঁকে।

বাড়ি ফিরে আবার রেডিয়াম ইন্সটিটিউটের কাজে মন দেন মেরি। অথচ তখন দু চোখেই ছানি পড়ে তিনি প্রায় অন্ধ হওয়ার যোগাড়। ততদিনে ইরিন কুরি কাজ শুরু করে দিয়েছেন রেডিয়াম ইন্সটিটিউটে। উনিশ শতকের ৩০ দশকের শুরুতে, ইরিন তাঁর স্বামী ফ্রেডারিক জুলিয়টের সাথে যৌথ গবেষণার কৃতিত্বস্বরূপ নোবেল পুরস্কার পান রসায়নে। শেষদিকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে লম্বা ছুটিও নিতেন মেরি, এবং প্রায়ই থাকতেন প্রচণ্ড রকমের ক্লান্ত।

মেরির শেষ বড় ধরনের প্রকল্পটি ছিল নিজের প্রভাব খাটিয়ে আরেকটি রেডিয়াম ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা। সদ্য স্বাধীন হওয়া পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারসতে গড়া হয় এই রেডিয়াম ইন্সটিটিউট। মেরির এই মহতী কাজে মনপ্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁর বোন ব্রনিয়া। রেডিয়াম ইন্সটিটিউটটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাবতীয় খাটাখাটনি করেছেন ব্রনিয়া। ১৯২৯ সালে আবার এক গ্রাম রেডিয়াম বিক্রি করতে আমেরিকা যান মেরি। এবার তিনি টাকাটা তুলে দেন ওয়ারসের রেডিয়াম ইন্সটিটিউটের ফান্ডে। এই প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ১৯৩২ সালের ২৯ মে। মেরি সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেদিন। আর এটাই ছিল জন্মভূমিতে তাঁর শেষ সফর।

দু বছর পর, ১৯৩৪ সালের মে-তে প্যারিসে নিজের ল্যাবরেটরিতে শেষবারের মতো যান মেরি। জ্বর হওয়ায় সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন তিনি। কোনো ডাক্তারই সঠিকভাবে তাঁর রোগ ধরতে পারেন নি। স্বাস্থ্যকর হাওয়ার জন্য তাঁকে পাঠানো হয় সেভয় মাউন্টেইন্স-

banglainternet.com

এর স্বাস্থ্যনিবাসে। কিন্তু তাঁর শরীরের কোনো উন্নতি ঘটে নি আর। ৪ জুলাই ৬৬ বছর বয়সে মারা যান তিনি। সেসময় তাঁর শরীরে রোগের

যে লক্ষণগুলো দেখা গিয়েছিল, তার ধরনধারণ বিবেচনা করে আজকের ডাক্তারদের ধারণা লিউকেমিয়া হয়েছিল মেরির।

এক ধরনের ক্যান্সার এটা। দীর্ঘদিন বিকিরণ নিয়ে কাজ করায় তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল শরীরে। তিনি যে এতদিন বেঁচে ছিলেন, এটাই এখন বিজ্ঞানীদের বিরাট বিস্ময়।

শেষ কথা

মেরি কুরি সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় থাকা সঠিক মানুষ। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কঠোর পরিশ্রমী, একজন ভালো বিজ্ঞানী, আর প্রতিভা বিকাশের জন্য পেয়েছিলেন প্রথম শ্রেণীর এক সহযোগী। মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়ায় সমাজের নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, একজন পুরুষের বেলায় সচরাচর যে ব্যাপারটি ঘটে না। তবে দৃঢ়সঙ্কল্পের কারণে একজন নারী হয়েও প্রতিকূলতাকে জয় করে তিনি পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, এবং জন্ম দিয়েছেন কিংবদন্তির। হয়তোবা নারী হওয়ার কারণেই এত বেশি খ্যাতি তিনি পেয়েছেন, বিশেষ করে মৃত্যুর পর, পুরুষ হয়ে জন্মালে যা আসত না।

মেরির মৃত্যুর পর প্রায় ৭০ বছর পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে। এখন পেছন ফিরে তাকালে খুব সহজেই দেখা যায় একজন বিজ্ঞানীর ইমেজের চেয়ে তাঁর মহীয়সী নারীর রূপ কতটা উজ্জ্বল। এ কারণেই মেরি কুরির এই জীবনীতে তাঁর শৈশবকাল এবং কষ্টের সংগ্রাম স্থান পেয়েছে বেশি। আর ১৯০৬ সালের পর মেরির যে ব্যক্তি এবং কর্মজীবন, তার স্থান হয়েছে কম। প্রকৃতপক্ষে, ১৯০৬ সালের পর সেরকম গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাজ করেন নি তিনি। মেরির জীবনী পড়লে তাঁর অসাধারণ গুণাবলিকে নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি দেবেন পাঠক। তবে একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে। মেরির এই বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বটা কোথায়?

banglainternet.com

বিজ্ঞানের জগতে মেরিকে এখনো 'সর্বকালের সেরা মহিলা বিজ্ঞানী' হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু বারবারা ম্যাকক্লিনটকের মতো জিনেটিক বিশেষজ্ঞের সাথে তুলনা করলে বারবারাকেই দিতে হয় এ সম্মান—যদিও এ ধরনের তুলনা করতে যাওয়াটা একটা ঘৃণ্য কাজ। তেজস্ক্রিয়তার উদ্ভাবন বিজ্ঞানের জগতে নিঃসন্দেহে একটা বড় ধরনের টার্নিংপয়েন্ট, কিন্তু সেটার উদ্ভাবক বেকুয়েরেল। ইউরেনিয়ামই শুধু একমাত্র তেজস্ক্রিয় ধাতু নয়—বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ওই আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে মেরি এ কাজ করার আগে গারহারড্ট শ্মিড্ট এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌছেন। এটা ঠিক যে, মেরির গবেষণা ছিল আরো ব্যাপক, প্রাপ্ত সুযোগের বেশিরভাগ কাজে লাগিয়েছেন তিনি, তবে তিনি অনুসরণ করেছেন শ্মিড্ট-এর থোরিয়ামের সক্রিয়তা বিষয়ক রিপোর্ট। ফলে কাজটা অধিকতর সহজ হয়ে গিয়েছিল তাঁর জন্য। পরবর্তী সময়ে একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে আকরিক থেকে বের করে নিয়ে আসেন পোলোনিয়াম এবং রেডিয়াম।

পরমাণু এবং তার উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য মেরির গবেষণার প্রতিটা ধাপই অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে মেরি যা উদ্ভাবন করেছেন, সেসব এসেছে অন্য সব বিজ্ঞানীদের ব্যাপক গবেষণার সূত্র ধরে। রাদার ফোর্ডকে দিয়ে শুরু হয় তাঁর অনুসরণ। তেজস্ক্রিয়তার ইতিহাসে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার ভিত্তিতে জোর দিয়ে বলা যাবে, 'মেরি কুরি ছাড়া আমরা তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে কখনো জানতে পারতাম না।' তিনি বড়জোর এই আবিষ্কারটাকে দুএক বছর এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। সুপ্রিয় পাঠক, যদি এই আলোচনাকে ঘৃণ্য নিন্দা ভেবে থাকেন, তা হলে মনে রাখবেন এরকম সমালোচনার ভেতর দিয়ে বিজ্ঞানের বেশিরভাগ উন্নয়ন ঘটে।

প্রকাশনায় বড় বেশি দেরি হয়ে যাওয়ায় চার্লস ডারউইন হারাতে বসেছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক সম্পদ। তিনি হয়তো দাবি করতে পারতেন না নিজেকে 'বিবর্তনবাদের জনক' বলে। তাঁর জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। মেরি কুরিও তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে সেভাবে শীর্ষে চলে এসেছেন। তাঁকে যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের শীর্ষস্থানটি দেওয়া হয়, তাঁর ভক্তরা হয়তোবা খুব বেশি রেগে যেতে পারবেন না। একটা গল্প হিসেবে মেরির জীবনকাহিনীর নিশ্চয়ই আলাদা একটা মূল্য রয়েছে, বিজ্ঞানের পটভূমিতে তার মূল্য খুঁজতে যাওয়াটা অর্থহীন। ❑

banglainternet.com
banglainternet.com